খেলাফত বনাম জাহালত

সূচীপত্র

ভূমিকা:

আল-হামদু লিল্লাহ্, ওয়াস-সালাতু ওয়াস সালামু আলা রসুলিল্লাহ্, আম্মা বাদ ....

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে কেউ বায়াত বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয়।

[মুসলিম]

এই হাদীসে বায়াত হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং বায়াত বিহীন মৃত্যুকে জাহিলিয়াতের মৃত্যু নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইবনে হাযার আসক্বালানী رحمه الله এখানে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর অর্থ সম্পর্কে বলেন,

وَالْمُرَادُ بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ...... حَالَةُ الْمَوْتِ كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَالٍ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاعٌ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ

এখানে জাহেলিয়াতের মৃত্যু এর অর্থ হলো, (ইসলাম আসার পুর্বে আরব দেশে) জাহেলী যুগের লোকেদের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় তথা কোনো অনুসরণীয় নেতা না থাকা অবস্থায় বিভ্রান্তভাবে মৃত্যু বরণ করা। যেহেতু (জাহেলী যুগে) আরব দেশের লোকেরা এ বিষয়ে (একক নেতৃত্বের আনুগত্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে) অনবহিত ছিল।

[ফাতহুল বারী]

মোট কথা জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা একজন নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বংশগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ছোট ছোট দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে ছিল। এক দল অন্য দলের নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে তাদের পক্ষে একতাবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় নি। যেভাবে সে সময় রোম-পারস্যের লোকেরা করেছিল। কিন্তু ইসলাম বংশ গোত্র ইত্যাদি পরিচয় ভুলে ঈমানী পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে সকল মুসলিমকে এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হতে নির্দেশ দেয়। যাতে তারা বিশ্বের বাতিল শক্তির মুকাবিলায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড়াতে পারে এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে পারে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার হাতে বায়াত হয়ে একতাবদ্ধ থাকবে এটাই ইসলামের নীতি। বিপরীতে দেশ, ভাষা, বংশ, গোত্র ইত্যাদি পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া

ইসলামের দৃষ্টিতে জাহেলিয়াত হিসেবে গণ্য।

একবার কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন আনসার সাহাবা আর একজন মুহাজির সাহাবা পরস্পরের মধ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তখন আনসার সাহাবা চিৎকার করে বলেন, ওহে আনসাররা আর মুহাজির সাহাবা চিৎকার করে বলেন ওহে মুহাজিররা। এই ডাক শুনে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ

কি ব্যাপার জাহেলিয়াতের ডাক কেনো?

সাহাবায়ে কিরাম সব ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন,

دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَة

এসব পরিত্যাগ করো কেননা তা দুর্গন্ধময়। [বুখারী]

দেখা যাচ্ছে দলীয় পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের মধ্যে পৃথক দুটি দল সৃষ্টি করা জাহেলিয়াত যদিও আনসার বা মুহাজিরের মতো বরকতময় নাম হয়। পরিচয়ের জন্য বংশ, গোত্র বা দেশীয় নামকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এসব পরিচয়ের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক নেতৃত্ব গঠন করে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে দূর্বল করে দেওয়া দূর্গন্ধময় জাহেলিয়াত হিসেবে গণ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦]

তোমরা মতপার্থক্য করো না তাহলে ব্যর্থ হবে। আর তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।

[আনফাল/৪৬]

একারণে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, পুরো মুসলিম উম্মাহ বংশ, গোত্র, দেশ বা ভাষা ইত্যাদি সব ভুলে এক জাতি হিসেবে এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকবে। মুসলিম উম্মাহর একাধিক নেতা থাকা কখনও বৈধ নয়। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ» ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلِ

বনী ইসরাইলকে নবীরা শাসন করতো। যখন একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই তবে

খলীফা হবে। অনেক সময় খলীফা (একই যুগে) একাধিকও হবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, তখন আমরা কি করবো? রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, প্রথম ব্যক্তির বায়াত পুর্ণ করো। [মুসলিম]

ইমাম নাব্বী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْدَ خَلِيفَةٍ فَبَيْعَةُ الْأَوَّلِ صَحِيحَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا وَبَيْعَةُ الثَّانِي بَاطِلَةٌ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ طَلَبُهَا وَسَوَاءٌ عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الأول جَاهِلِينَ وَسَوَاءٌ كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَدٍ

এই হাদীসের অর্থ হলো, যখন একজন খলীফার পর অন্য একজন খলীফার হাতে বায়াত দেওয়া হয় তখন প্রথম ব্যক্তির বায়াত পূর্ণ করতে হবে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির বায়াত বাতিল হবে। তার বায়াত পূর্ণ করা হারাম হবে। ঐ ব্যক্তির জন্য বায়াতের দাবী করাও হারাম হবে। যারা দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে বায়াত হয়েছে তারা আগের বায়াত সম্পর্কে জানুক বা না জানুক। দুইজনের বায়াত একই দেশে হোক বা ভিন্ন ভিন্ন দুটি দেশে হোক। [শারহে মুসলিম]

এরপর তিনি বলেন,

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ اتَّسَعَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا

এ বিষয়ে আলেমরা একমত হয়েছেন যে একই যুগে দুইজন খলীফা বৈধ নয়। ইসলামী ভূমি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হোক বা না হোক। [শারহে মুসলিম]

অন্য একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

শীঘ্রই অনেক ফিতনা-ফাসাদ হবে। অতএব, একতাবদ্ধ উম্মতকে যে পৃথক করতে চায় তাকে হত্যা করো সে যেই হোক না কেনো। [মুসলিম]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী বলেন,

فِيهِ الْأَمْرُ بِقِتَالِ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ أَرَادَ تَفْرِيقَ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَيُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ قُوتِلَ وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ شَرُّهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ

এখানে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা মুসলিমদের বিভক্ত করে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাকে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি সে তা না শোনে তবে তার সাথে লড়াই করতে হবে। যদি তাকে হত্যা

করা ছাড়া নিবৃত করা না যায় তবে তাকে হত্যা করতে হবে। [শারহে মুসলিম]

মোট কথা, এভাবে মুসলিম উম্মাহকে এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ রাখাটাই ইসলামের নীতি। আর এর বিপরীতে মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন দল উপদল বা দেশে দেশে বিভক্ত করাই মূলত জাহেলিয়াত যা থেকে এসকল হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

অথচ বর্তমানে আমরা দেখি যারা দ্বীনের জন্য কিছু করার চেষ্টা করে তারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত। প্রতিটি দল নিজের দলীয় নেতার হাতে বায়াত হওয়াকে আবশ্যক মনে করে এবং তার হাতে বায়াত না হলে জাহেলী মৃত্যু হবে বলে দাবী করে। এ বিষয়ে তারা উপরোক্ত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করে। বর্তমান যুগের অনেক আলেম নিজ নিজ দেশের শাসকের আনুগত্য করার ব্যাপারে উপরোক্ত হাদীস পেশ করেন এবং যে ব্যক্তি যে দেশের নাগরিক ঐ দেশের সরকারের আনুগত্য না করলে তার জাহেলী মৃত্যু হবে এমন দাবী করেন। অথচ, এভাবে দলে-দলে বা দেশে দেশে বিভক্ত হওয়াটা নিজেই একটা জাহেলিয়াত। এছাড়া যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বদলে দেশ স্বাধীন করা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে অনেকে তাদের শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অথচ রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

যে কেউ অন্ধকার পতাকাতলে যুদ্ধ করে (দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়)। গোত্রগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে সে কারও উপর রাগান্বিত হয় এবং গোত্রগত পরিচয়ের দিকে মানুষকে ডাকে অথবা গোত্রগত পরিচয়ের ভিত্তিতে অন্যকে সহযোগিতা করে (যুদ্ধ করে) এভাবে নিহত হলে তার জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয়। [সহীহ মুসলিম]

বর্তমান যুগের আলেম-ওলামারা এসব শাসকদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেন অথচ তারা তাগুতী আইনে দেশ পরিচালনা করে যা নিজেই একটি জাহেলিয়াত। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: ٥٠]

তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান চায়? মুমিনদের নিকট আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধান আর কে দিতে পারে। [মায়েদা/৫০]

দেখা যাচ্ছে যে হাদীসে মুসলিমদের মধ্যে সকল প্রকার দলাদলী বন্ধ করে বংশ, গোত্র, ভাষা, দেশ ইত্যাদি ভুলে সকল মুসলিমকে একতাবদ্ধ হয়ে এক নেতার অধীনে

থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই হাদীসকে দলে দলে বা দেশে দেশে বিভক্ত হওয়া এবং তাগুতের আনুগত্য করে যাওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে হাদীসে জাহেলিয়াতকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে সেই হাদীসকে সকল প্রকার জাহেলিয়াতের পক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্ভবত একই বলে, অল্প বিদ্যা ভয়ংকর!! বর্তমান যুগের নামধারী বিদ্যান লোকেরা যাতে লিপ্ত রয়েছেন।

এসব বিদ্যা-বুদ্ধিহীন বিদ্যান লোকেরা যেটাই বলুক উপরোক্ত দলীল-প্রমাণের আলোকে এটাই প্রমাণিত যে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। এই বিষয়টাকে বলা হয় খিলাফত (الخلافة) এবং যার হাতে বায়াত দিয়ে একতাবদ্ধ থাকতে হয় তাকে বলা হয় খলীফা (الخليفة)।

খেলাফত ও খলীফা শব্দদুটি আমরা সবাই শুনেছি কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর গুরুত্ব কি তা আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝি নি। এক কথায় বলা যায়, খেলাফত বলতে বোঝায় সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার বিভক্তি থেকে মুক্ত করে এমন একজন নেতার অধীনে একত্রিত করা যিনি তাদের আল্লাহর বিধান মতে পরিচালনা করবেন। এটাই হলো খেলাফত এবং এই নেতাকেই বলা হবে খলীফা। এর বিপরীতে মুসলিমরা দলে দলে বিভক্ত হওয়া, দেশে দেশে পৃথক শাসন প্রতিষ্ঠা করা বা তাগুতী আইন মেনে নেওয়া ইত্যাদি সবই জাহেলিয়াত কুরআন-হাদীসে যা থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

বেশিরভাগ মুসলিমই খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনবহিত। তাদের বেশিরভাগই আদৌ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা হোক এটা চায় না বা মুখে চাইলেও কাজে-কর্মে সে জন্য কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টা করে না। কেউ কেউ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য কাফিরদের দেখানো পন্থায় যেমন গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পন্থায় চেষ্টা করে। এসব পন্থায় যে সত্যিকার ইসলামী খেলাফত তথা এক নেতার অধীনে বিশ্বব্যাপী একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয় এই সহজ কথাটা তারা বোঝে না অথবা বুঝতে চায় না। খেলাফত নয় বরং জাহালাতের মধ্যে থাকতেই তারা অধিক পছন্দ করে।

এদের বিপরীতে অতি অল্প সংখ্যক সত্যপন্থী মুসলিম আল্লাহ ﷻ ও তার রসুলের দেখানো পন্থা তথা জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় রত। এদের সম্পর্কেই রসুলুল্লাহ্

ﷺ বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থেকে লড়াই করতে থাকবে। [মুসলিম]

এরাই মুসলিম উম্মাহর জন্য একমাত্র আশার আলো। লক্ষ কোটি জাহেল লোকের মধ্যে এরাই একটি মাত্র দল যারা প্রচলিত জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্যকে চিনতে পেরেছে এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ লড়াই করার শপথ নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এসব মুজাহিদদের মধ্যে আবার নতুন জাহেলিয়াত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে একটি দল খেলাফত ঘোষণার দাবী করছে অন্য একটি দল তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করছে। খেলাফত থেকে দূরে থাকার জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাত পেশ করছে। কখনও বলছে,

— এখনও খেলাফত ঘোষণার সময় হয়নি।

আবার কখনও বলছে,

— পূর্বেই আমাদের একজন খলীফা ছিল। তাকে বাদ দিয়ে নতুন করে খেলাফত ঘোষণা করা ইসলামে বৈধ নয়। যেহেতু একই যুগে দুজন খলীফা থাকা সম্ভব নয়।

— কেউ কেউ বলছে, বর্তমান খেলাফত রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেহেতু এখানে সকল উম্মতের পরামর্শ নেওয়া হয় নি।

তাদের দাবী,

— সময় হলে সকল উম্মতের পরামর্শ নিয়ে নতুন একটা খেলাফত ঘোষণা করা হবে। সেটাই হবে আসল খেলাফত। সেই খেলাফতকে যে মানবে না তার জাহেলী মৃত্যু হবে। বর্তমান খেলাফতকে না মানলে জাহেলী মৃত্যু হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। যেহেতু এটা নবুয়তের আদলে খেলাফত নয়।

এমতাবস্থায় কোন দলের মত সঠিক সেটা নির্ণয় করা একান্ত জরুরী। যেহেতু যুগের খলীফার হাতে বায়াত না হলে জাহেলী মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যুগের খলীফা কে? বর্তমানে যিনি খেলাফত দাবী করেছেন তিনি, নাকি যার হাতে মানুষ আগেই বায়াত হয়ে ছিল তিনিই আসল খলীফা? নাকি আসল খলীফা এখনও আসে নি বরং

ভবিষ্যতে আসবে? সকল উম্মতের পরামর্শ নিয়ে যাকে মনোনিত করা হবে। অতএব, ততদিন মুসলিমদের অপেক্ষা করা উচিৎ।

বিষয়টা আসলেই অনেক জটিল। যদি সত্যিই আগে কোনো খলীফার হাতে বায়াত থাকে তবে বর্তমান খলীফার বায়াত অবশ্যই পরিত্যাক্ত যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি সেক্ষেত্রে বর্তমান খলীফার আনুগত্য খেলাফত নয় বরং জাহালত হিসেবে গণ্য। কিন্তু যদি আগে কোনো খলীফার হাতে বায়াত না থাকে এবং বর্তমান খলীফা সত্যিকার খলীফা হিসেবে গণ্য হন তবে হিংসার বশবর্তী হয়ে বা অন্য কোনো কারণে এই খলীফার খেলাফতকে অস্বীকার করে নতুন একটা খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করা জাহেলিয়াত হিসেবে গণ্য। যেহেতু একজন খলীফার উপস্থিতিতে অন্য কোনো খলীফার হাতে বায়াত হওয়া বৈধ নয় বরং সেটা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করা হিসেবে গণ্য। বর্তমান খেলাফত আমার মন মতো হয়নি তাই সেটাকে মানবো না এটা সঠিক নীতি নয়। যেহেতু খলীফার আনুগত্যের বিষয়টি মনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না রবং শরীয়তের মানদন্ডে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হলেই খলীফার আনুগত্য করা আবশ্যক হয় আর তার বিরুদ্ধাচারণ করা জাহালত হিসেবে গণ্য হয়। তার চেয়েও বড় জাহেলিয়াত হলো একজন খলীফা থাকতে অন্য আরেকটি খলীফা মনোনয়নের চিন্তা করা। এই সর্বনাশা নীতির উপর নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহকে দুটি দলে বিভক্ত করলে তারা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ করে কতটা ক্ষতি সাধন করতে পারে আলী ﵁ এর সাথে মুয়াবিয়া ﵁ এর যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস থেকে তা আমাদের শিখে নিতে হবে। কিন্তু বর্তমান খেলাফত যদি বৈধ খেলাফত নাই হয় তবে তো আমাদের আরেকটা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

তাহলে কোনটা খেলাফত আর কোনটা জাহালত এটা নির্ণয় করার জরুরত এখন সর্বাপেক্ষা বেশি।

অনেকে অবশ্য অপেক্ষায় আছেন হাসান ﵁ যেভাবে নিজের খেলাফত মুয়াবিয়া ﵁ এর হাতে তুলে দিয়ে তার হাতে বায়াত হয়ে মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন তদ্রুপ এই দুটি দলের মধ্যে একটি দল হয়তো অন্যটির সাথে একমত হয়ে মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ হতে সহায়তা করবে। ততদিন আমরা নিরবে অপেক্ষা করবো। প্রশ্ন হলো, যদি তারা একমত হওয়ার আগেই আমরা মারা যায় আর সেই মৃত্যুটা জাহেলীয়াতের মৃত্যু হয় তাহলে কেমন হবে? এদুটি দল যখন একমত হবে তখন তো পুরো মুসলিম উম্মাহই খুশি হবে এবং তাদের সাথে যোগ

দেবে। কিন্তু তারা একমত হওয়ার আগেও কি মুসলিমদের উপর হক বেছে নেওয়া দায়িত্ব নয়? এ দুটি দলের মধ্যে কোনটি হক বা হকের অধিক নিকটবর্তী সেটা লক্ষ্য করে তার সাথে থেকে কাজ করাটাই কি বুদ্ধির দাবী নয়?

অনেকে অবশ্য ইচ্ছামত একটি দলকে বাছাই করেছেন এবং সেটাকেই হক বলে মনে করছেন। কিন্তু হক তো আর কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না অতএব, নিজের খেয়াল-খুশি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পরিত্যাগ করে নির্ভেজালভাবে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে যেটা হক হিসেবে প্রমাণিত হয় সেটা বাছাই করে তাদের সাথে যোগ দিতে হবে। এটা মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে বারবার বলা হয়েছে মুসলিমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে থাকবে। এসব বিভিক্ত দেখে যদি আমরা দমে যায় আর বলি হুজুররা একমত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে থাকবো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে হবে। হক পথে টিকে থাকার সৌভাগ্য হবে না। তাই বলব, এধরনের অপেক্ষার নীতি পরিত্যাগ করে দুটি দলের মধ্যে কোনটি সঠিক তা পরীক্ষা করে নির্ণয় করতে হবে। অবশ্য এটা নির্ণয় করতে গিয়ে অন্ধ দলপ্রিতী বা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার নীতি অবলম্বন করলে হবে না বরং নিরপেক্ষভাবে সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে হককে হক আর বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করতে হবে। যদি কেউ মনে করে আমার দলের নেতারা ভুলের উর্ধ্বে বা তাদের কথাই ঠিক আর অন্যদের কথা ভুল তবে তার পক্ষে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, দুটি দলের মধ্যে যাচাই-বাছায়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টা স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, পাপেরও উর্ধ্বে নয়। এমন বললে হবে না যে, অমুক আশি বছর ধরে জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এই বুড়ো বয়সে তিনি কি মিথ্যা কথা বলবেন? আবার এমনও বলা যাবে না যে অমুক রসুলের বংশধর অতএব যে যাই বলুক বা যাই করুক তাকেই মেনে চলতে হবে। যেহেতু ব্যক্তি দিয়ে সত্য চেনা যায় না বরং সঠিক মাপকাঠিতে সত্যকে চিনতে হয়। এই সত্য কথাটি যাদের পছন্দ হয় না তাদের পক্ষে সত্যকে চিনে নেওয়া সম্ভব নয়। একটা বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা কোনো ব্যক্তি বা দলকে পুজা করার জন্য নয় বরং এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। যদি আল্লাহর বাণীর আলোকে কেউ অপরাধী প্রমাণিত হয় তবে বয়স বা বংশ দিয়ে তাকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই বরং তাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং সত্যের উপর যে টিকে আছে তাকে গ্রহণ করতে হবে। এই মূলনীতিতে যারা একমত তাদের আমি পরবর্তী

আলোচনা মনোযোগ সহকারে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করবো। হয়তো মহান আল্লাহর এর ওসীলায় তাকে সঠিক বুঝ প্রদান করবেন।

এই গ্রন্থে আমাদের মূলনীতি

মুজাহিদদের দুটি দলের মধ্যে কোন দলটি সঠিক তা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি মূলনীতির অনুসরণ করবো।

১. বর্তমান যুগের মুজাহিদরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারা একজন অন্যজনকে দোষারোপ করছে এবং একজন যা বলছে অন্য জন তার বিপরীত বলছে। একদল অন্য দলকে নানা রকম অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। দুটি দলের মধ্যে বাদ-বিবাদ হলে যা হয় এখানেও হুবহু তাই হয়েছে। অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করা, মুসলিমদের অকারণে কাফির বলা, আমেরিকা বা ইরানের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগ যা আগে কাফির-মুশরিক এবং তাদের দোসর মুরতাদ-মুনাফিকরা মুজাহিদদের ব্যাপারে বলে বেড়াতো এখন মুজাহিদদের একটি দল অন্য দল সম্পর্কে এধরনের মন্তব্য করছে। এসব মন্তব্যের বেশিরভাগই সসর্ব মিথ্যা। দুই দলের মধ্যে যেসব নির্বোধ অনুসারী আছে তারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব আজগুবী মন্তব্য করছে। বিশেষত ইন্টারনেটে লেখা-লেখি করে তারা একে অপরের দোষ চর্চা করছে। এ কারণে মূল দলটিকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। যেহেতু এসব লোকেরা ঐ সব দলের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত নয়। অতএব, এই গ্রন্থে এসব অঘোষিত ব্যক্তিবর্গের কোনো মন্তব্যকে আমরা সামান্যও গুরুত্ব দেবো না। যেহেতু তার বেশিরভাগই মিথ্যা আর যদি সত্যও হয় তবু তার কোনো গুরুত্ব নেই যেহেতু সঠিক কোনো উৎস থেকে তা বর্ণিত নয়।

২. উভয় দলের মুজাহিদদের সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের মিডিয়ায় যেসব খবর প্রকাশিত হয় সেগুলোকে আমরা কোনো গুরুত্ব দেবো না। যেহেতু কাফিররা মুসলমানদের বিশেষত মুজাহিদদের শত্রু। অতএব মুজাহিদদের ব্যাপারে তাদের মন্তব্যকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা নিতান্ত হাস্যকর। বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে না। একইভাবে মুসলিমদের মধ্যে যেসব বিভ্রান্ত লোকেরা মুজাহিদদের দুর্নাম করে তারা সাধারন মুসলিম হোক বা পথভ্রষ্ট আলেম ওলামা হোক, সাংবাদিক হোক বা তাগুতের অনুসারী হোক তাদের ফতোয়া বা স্বাক্ষ্যকে মুজাহিদদের বিপক্ষে দলীল হিসেবে মনে করা যাবে না। যেহেতু তারা এ যাবতকালে অন্যায়ভাবে মুজাহিদদের নিন্দা করেই এসেছে।

আমরা কেবল ঐ সকল মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবো যা এই দুটি দলের নেতৃস্থানীয়দের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

এখন আমরা মূল আলোচনা শুরু করবো। প্রথমেই মূল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকের সামনে পেশ করবো যাতে পাঠক আলোচনার বিষয়বস্তু কি সেটা অনুধাবন করতে পারেন। তারপর উভয় দলের নেতৃস্থানীয়দের বক্তব্য থেকে প্রমাণ সহ এসব ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করবো।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বর্তমান যুগের জিহাদের ইতিহাস অনেক লম্বা। রাশিয়ার মুকাবিলায় আফগানদের লড়াই। আফগানস্তানে মোল্লা উমরের নেতৃত্বে তালেবানদের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা এবং উসামা বিন লাদিনের আল কায়েদা নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা থেকে এর শুরু। আল কায়েদার সীমাহীন পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে জিহাদের ডাক পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আফগানস্তান ও ইরাকে আমেরিকার বর্বরোচিত আগ্রাসনের পর পৃথিবীতে নতুন করে জিহাদের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে মুজাহিদরা ছোট ছোট দল গঠন করে তাগুতী শক্তির সাথে লড়াই করার ঘোষণা দেয়। তাদের মধ্যে অনেকেই শায়েখ উসামা বিন লাদিনের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয়। ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলে বায়াত। বিশ্বের যে প্রান্তেই কোনো মুজাহিদ দল জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতো শুরুতেই তারা আল-কায়েদার নিকট বায়াত হওয়া নিজেদের উপর দায়িত্ব মনে করতো। এভাবে প্রথম বারের মতো দেশ ও জাতির সীমানা পেরিয়ে মুসলিমরা একজন নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হওয়ার বিধানের উপর বাস্তব আমল শুরু করে। এরই ধারবাহিকতায় ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন শুরু হলে আবু মুসয়াব আজ-জারকাবী নেতৃত্ব দিয়ে মুজাহিদদের একটি দল গঠন করে আমেরিকান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। প্রথমে নিজস্ব নেতৃত্বে দল গঠন করলেও পরবর্তীতে তিনি উসামা বিন লাদিনের নিকট বায়াত হন। এভাবে ইরাকে আল-কায়েদার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় ইরাকে আল-কায়েদা ছাড়াও বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জিহাদী সংগঠন ছিল যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করতো। অনেক সময় মতাদ্বন্দে জড়িয়ে পড়ে তারা নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। আল্লাহর বিশেষ রহমতে পরবর্তীতে এসব মুজাহিদরা নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্যকে উপেক্ষা করে একতাবদ্ধ হয়ে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমে তারা মুজাহিদদের পরামর্শ সভা নামে একতাবদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে ইরাকে

ইসলামী রাষ্ট্র নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এ সময় ইরাকে বিদ্যমান সকল জিহাদী সংগঠন নিজেদের আগের নাম ও পরিচয় পরিত্যাগ করে আবু উমর আল বাগদাদীর নেতৃত্বে "দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়া" (دولة العراق الاسلامية) তথা ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র নামে একতাবদ্ধ হয়। মুজাহিদদের মধ্যে একতা রক্ষার স্বার্থে সেদিন ইরাকের আল-কায়েদা পূর্বের বায়াত থেকে মুক্ত হয়ে আবু উমর আল-বাগদাদীর নিকট বায়াত হওয়ার মাধ্যমে অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে একতাবদ্ধ হয়। আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই ঐক্যকে স্বাগত জানায়। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে নতুন একটি যুগের সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ইসলামী রাষ্ট্র। এরপর আমেরিকার হামলায় ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের আমীর আবু উমর আল-বাগদাদী শহীদ হলে মজলিসে শুরার পরামর্শে রসুলের বংশধর শায়েখ আবু বকর আল-কোরেশীকে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর মনোনিত করা হয়।

এ পর্যন্ত ঘটনা স্বাভাবিকই ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় ছিল। তারা সকলে এক নেতৃত্বে একতাবদ্ধ ছিল না ঠিকই কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল। মুজাহিদদের বিভিন্ন দল পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে জিহাদে রত ছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দল ছিল তিনটি। আফগানস্তানের ইসলামী ইমারত, ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র আর কোকাজের ইসলামী ইমারত। বিন লাদেন এবং তার আল-কায়েদা মূলত আফগানস্তানের ইসলামী ইমারতের আমীর মোল্লা উমরের হাতে বায়াত ছিলেন। অর্থাৎ আল-কায়েদা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মুজাহিদরা পৃথক কোনো দল ছিল না বরং তালেবানদের অনুগত একটি বাহিনী ছিল। তবে এই তিনটি দলের কোনোটি অন্যটির অধীন ছিল না বরং তারা একে অপরের আনুগত্য হতে মুক্ত ছিল। ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম মোল্লা উমর বা উসামা বিন লাদিনের হাতে বায়াতবদ্ধ ছিল না অন্য কোনো দলও ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের হাতে বায়াতবদ্ধ ছিল না। তবে তারা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগ রেখে কাজ করতো।

এভাবেই চলছিল। কিন্তু সিরিয়াতে বাশার আসাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলে মুজাহিদরা সেখানে জিহাদ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলো। এ লক্ষ্যে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা আবু বকর আল বাগদাদী তার হাতে বায়াতবদ্ধ একজন সৈনিক আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানীকে দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়াতে প্রেরণ করেন। তাকে তিনি সম্পদ ও সৈন্য দিয়ে সহায়তা করেন। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিরিয়ায়

মুজাহিদদের যে দলটি গঠন করা হবে সেটা যে আসলে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন তা শুরুতে প্রকাশ করা হবে না। যেহেতু কাফির-মুশরিকরা ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক অপবাদ রটাতো। তারা অকারণে মানুষ খুন করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে ইত্যাদি। সাধারন মুসলিমদের অনেকে এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের অপছন্দ করতো। পরিকল্পণা ছিল প্রথমে ভিন্ন নামে কাজ শুরু করে মুসলিমদের দেখানো হবে আসলে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের মুজাহিদরা কাফিররা যেমন বলে তেমন নয় বরং আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের আচার-আচরণ যেমন হওয়া উচিৎ তারা তেমনই। সিরিয়ার সাধারন মুসলিমরা যখন এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে তখন হঠাৎ ঘোষণা করা হবে এটা আসলে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন। যাতে তারা বুঝতে পারে এতদিন তারা এসব মুজাহিদ সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছে।

এই পরিকল্পণা অনুযায়ী আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানীর নেতৃত্বে সিরিয়াতে জাবহাতুন নুসরা (নুসরা ফ্রন্ট) নামে একটি জিহাদী দল গঠন করা হয়। কিছু কালের মধ্যে শামে জাবহাতুন নুসরা শক্ত ভিত স্থাপন করতে সক্ষম হয়। সে অবস্থায় আল-জুলানী তার আমীর আল-বাগদাদীর নির্দেশ মেনে চলতে গড়িমসি শুরু করেন। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অবস্থা অতিরিক্ত খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে এমন আশঙ্কায় পূর্বপরিকল্পণা অনুযায়ী ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর আবু বকর আল-বাগদাদী একটি অডিও বার্তায় ঘোষণা করেন,

— জাবহাতুন নুসরা আসলে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এবং এর আমীর আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানী আমাদের অনুগত সৈনিক।

এরপর তিনি ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র এবং জাবহাতুন নুসরা সম্মিলিত হয়ে ‘ইরাক ও শামের ইসলামী রাষ্ট্র’ নামে একীভূত হওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু জাবহাতুন নুসরা এর আমীর আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানী এ ঘোষণা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তবে তিনি নিজেকে আবু বকর আল বাগদাদীর অধীনস্ত হিসেবে স্বীকার করে নেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জাবহাতুন নুসরার সাথে পরামর্শ করা হয়নি এই অজুহাতে তিনি এটা মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং সরাসরি উসামা বিন লাদিনের শহীদ হওয়ার পর নিযুক্ত আল-কায়েদার নতুন আমীর আয়মান আল-জাওয়াহেরীর হাতে বায়াতের ঘোষণা দেন।

এখান থেকে বিরোধের শুরু। ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাবহাতুন নুসরাকে বায়াতভঙ্গকারী প্রতারক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর দুটি দলের

মধ্যে বিভিন্ন সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতে উভয় পক্ষের অনেক মুজাহিদ হতাহত হয়। এ সময় আবু বকর আল বাগাদাদীর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদরা শামের অনেক এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হয়।

সিরিয়াতে বিদ্যমান অন্যান্য জিহাদী সংগঠন, পরিচিত সব জিহাদী ওলামা-মাশায়েখ যেমন, আল-আবু মুহাম্মাদ আসেম আল-মাকদেসী, আবু ক্বাতাদা আল ফিলিস্তিনী, হানি আস-সুবায়ী, তারিক আব্দুল হালিম প্রমুখ এই বিরোধে সরাসরি জাবহাতুন-নুসরার পক্ষাবলম্বন করে। তারা একযোগে ইরাকের দাওলাতুল ইসলামকে খারেজী, চরমপন্থী, রক্তপিপাসূ ইত্যাদি নিকৃষ্ট খেতাবে ভূষিত করে। আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনী তো তাদের জাহান্নামের কুকুর পর্যন্ত বলে। এমতাবস্থায় এই বিরোধ নিরসনকল্পে তারা একটি নিরপেক্ষ শারয়ী আদালতে নিকট উভয় পক্ষকে বিচার প্রার্থী হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আবু বকর আল-বাগদাদীর নেতৃত্বে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র এই আদালতের নিকট বিচারপ্রার্থী হতে অস্বীকৃতি জানায়। একারণে বিরোধী পক্ষের লোকেরা তাদের শরীয়তের বিচার অমান্যকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে।

এরপর আল-কায়েদার আমীর আয়মান আজ-জাওয়াহেরী নিজে ইরাকের দাওলাতুল ইসলামকে সিরিয়া ছেড়ে ইরাকে ফিরে যেতে বলে। তাছাড়া তিনি আল-কায়েদার পক্ষ থেকে একবছরের জন্য আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানীকে শামের আমীর আর আবু বকর আল বাগদাদীকে ইরাকের আমীর হিসেবে ঘোষণা করেন। এক বছর পর তাদের পদ বহাল রাখা বা না রাখা নিজের কাধে তুলে নেন।

দাওলাতুল ইসলাম এ নির্দেশ মানতে সরাসরি অস্বীকার করে। আগে তারা আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানীকে বায়াত ভঙ্গকারী প্রতারক বলে গালি দিতো এরপর তারাই মানুষের নিকট বায়াত ভঙ্গকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর জবাবে দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে আল-কায়েদার নিকট বায়াত হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করা হয়। তবে আয়মান আজ-জাওয়াহেরী একটি বক্তব্যে বিভিন্ন নথিপত্র ঘেটে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে আসলে তারা তার নিকট বায়াতবদ্ধ।

এরপর ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। সবাই যখন দাওলাতুল ইসলামকে একটি নিরপেক্ষ শারয়ী আদালতে বিচার প্রার্থী হতে আহ্বান জানায় তখন দাওয়াতুল ইসলাম এটা অস্বীকার করে। দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলে, বর্তমানে মুজাহিদ নেতারা সবাই দুটি পক্ষে বিভক্ত। কেউ

তো জাবহাতুন নুসরার পক্ষে আর কেউ দাওলাতুল ইসলামের পক্ষে অতএব নিরপক্ষ বিচারক কোথায় পাওয়া যাবে? তার চেয়ে বরং আসুন আমরা একজনকে খলীফা নিয়োগ করি যাকে আমরা সবাই আনুগত্য করবো এবং তার অধীনে একতাবদ্ধ হবো। তার এই ডাকে কেউ সাড়া দেয় নি। তাদের মত ছিল এখনই খিলাফা ঘোষণা না করার পক্ষে। যেহেতু এখনও খেলাফত ঘোষণা করার সময় হয়নি। এর এক মাস পরেই ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম তাদের আমীর আবু বকর আল বাগদাদীকে মুসলিম জাহানের খলীফা হিসেবে ঘোষণা করে। এই খেলাফত ঘোষিত হওয়ার পর মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারন করে। আগে বিরোধ ছিল কেবল শামে এরপর পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে এই বিরোধ ছড়িয়ে পড়ে। মুজাহিদদের একটি অংশ এই খেলফতকে সঠিক খেলাফত মনে করে আবু বকর আল বাগদাদীর হাতে বায়াত হয় আর অন্য একটি অংশ এই খেলাফতকে বাতিল হিসেবে ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য যে আল-কায়েদা এবং তার অঙ্গ-সংগঠনগুলো খেলাফতের ঘোষণাকে সর্বাধিক অপছন্দ করে। বিভিন্ন যুক্তিতে তারা এই খেলাফতকে অস্বীকার করে। কখনও বলে, আমাদের পরামর্শ না নিয়ে খলীফা করা হয়েছে তাই এটা অগ্রহণযোগ্য। কখনও বলে, এখনও খেলাফত ঘোষণার সময় হয়নি। কখনও বলে, খলীফা তো রয়েছে। মোল্লা উমর আমাদের খলীফা।একজন খলীফা থাকতে আরেকজনকে নিয়োগ দেওয়া কিভাবে বৈধ হয়!

মুজাহিদদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ হয়তো সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই না করেই নিজ নিজ নেতাদের কথা মতো একটা দলে ঢুকে পড়েছেন। তবে অন্য একটি দল দো-টানার মধ্যে আছে। দুটি দলের দুরকম কথা শুনে তারা বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যারা ব্যক্তিপূজা ও দলপ্রিতী পরিত্যাগ করে সত্য-মিধ্যা যাচাই করতে চায় তাদের জন্য এই গ্রন্থে আমরা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক দলটির পরিচয় তুলে ধরতে চাই। আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

এটাই হলো মূল ঘটনা যা আমরা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। উভয় দলের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণের সময় তাদের কথা থেকেই উপরোক্ত ঘটনা প্রমাণিত হবে তাই এখানে পৃথকভাবে তাদের কথাবার্তা থেকে দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয় নি।

কে সত্যবাদী আর কে অপরাধী?

উপরের ঘটনাতে আমরা দেখেছি মুজাহিদদের মধ্যে বিরোধের শুরু শামের পবিত্র

ভূমিতে ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে জাবহাতুন নুসরার মতপার্থক্য দিয়ে এবং তার শেষ হলো, ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে খেলাফতের ঘোষণা দিয়ে। এই দুটি ঘটনা একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট তাই দুটি ঘটনাতে কে সত্যপন্থী আর কে অপরাধী তা নির্ণয় করা একান্ত জরুরী। যাতে মুসলিম উম্মাহ সত্যপন্থীকে বাছাই করে তার অনুসরণ করতে পারে। আর ফিতনাবাজকে পরিত্যাগ করে অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। প্রথমেই আমরা জাবহাতুন নুসরার সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরোধের ব্যাপারে আলোচনা করবো।

জাবহাতুন নুসরার সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরোধ

উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আমরা বলেছি, আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানী ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের আমীর আবু বকর আল বাগদাদীর অধীনে বায়াতবদ্ধ ছিলেন। আবু বকর আল বাগদাদী তাকে সিরিয়াতে প্রেরণ করেন এবং সৈন্য ও সম্পদ দিয়ে সহায়তা করেন। তবে কৌশলগত কারণে প্রথমে বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি। পরবর্তীতে আল-জুলানীর অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। এই ঘটনার কারণে এবং পূর্বের পরিকল্পণাকে সামনে রেখে আবু বকর আল-বাগদাদী জাবহাতুন নুসরাকে দাওলাতের সাথে একতাবদ্ধ করার নির্দেশ দিলে আল-জুলানী তা মানতে অস্বীকার করেন। এর ফলে উভয় দল বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে মুজাহিদদের মধ্যে ব্যাপক রক্তপাত ঘটে।

মুসলিমদের মাঝে এ ধরণের রক্তপাত কেউ আশা করে না যেহেতু এটা ফিতনা হিসেবে গণ্য। কিন্তু এই ফিতনার জন্য দায়ী কে?

অনেকে অবশ্য এর দায়ভার নিজের খেয়াল-খুশি মতো যে কোনো একটি দলের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাধারন বুদ্ধির লোকেরা একবাক্যে দাওলাতে ইসলামকে এ ব্যাপারে দায়ী হিসেবে আখ্যায়িত করে যেহেতু তারা ইরাক থেকে সিরিয়ার ভূমিতে আগ্রাসন চালিয়েছে। কাফির-মুশরিকদের প্রচার-প্রসারের ফলে দেশত্ববোধ সাধারন মুসলিমদের মধ্যে এমনভাবে স্থান গেড়েছে যে মুসলিম হোক কাফির হোক ভীন দেশের কেউ অন্য কোনো দেশে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করলে এটা সাধারনভাবে সকলের নিকট নিন্দনীয় হিসেবে গণ্য হয়। বলাবাহুল্য যে এটা একটা জাহেলী বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, যারা নিজেদের আলেম-ওলামা বা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে দাবী করে তারাও একদেশের মুসলিমরা অন্যদেশে আক্রমণ করে ঐ দেশের তাগুতী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানে ইসলামী

শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে বিষয়টাকে নিন্দা করতে শুরু করে। এখানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে, বেশিরভাগ লোক মনে করেছে আল-জুলানী নিজে এবং তার অনুসারীদের বেশিরভাগই সিরিয়াবাসী হওয়ার কারণে সিরিয়াতে নেতৃত্ব দেওয়ার অধিক হকদার। ইরাকের লোকেরা সিরিয়াবাসীদের উপর নেতৃত্বদেবে এটা তাদের নিকট একবাক্যে বে-মানান ও বে-খাপ্পা মনে হয়। একারণে বেশিরভাগ লোক ইরাকের দাওলাতে ইসলামের সাথে জাবহাতুন নুসরার বিরোধে দাওলাতুল ইসলামকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে আর জাবহাতুন নুসরাকে সত্যপন্থী হিসেবে মনে করেছে। দুঃখজনকভাবে তাদের মধ্যে অনেক নামধারী আলেম-ওলামাও রয়েছে। তাদের সোজা কথা, আল-জুলানী সিরীয় অতএব তিনিই সিরিয়ার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন, ইরাকের বাগদাদী নয়। যারা এভাবে চিন্তা করেন, তাদের সাথে আমাদের কোনো কথা নেই যেহেতু এটা জাহেলী চিন্তাধারা। তাদের উচিৎ দেশপ্রেম বা দেশত্ববোধ কিভাবে একজন মুসলিমের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সে সম্পর্কে লিখিত কিতাবাদি পড়াশোনা করা। সত্যপন্থীরা কখনও দেশত্ববোধ বা গোত্রপ্রীতির উপর নির্ভর করে হক বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করে না। বরং শরীয়তের মানদন্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করে হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে।

বিপরীত দিকে এই ফিতনার দায়ভার যারা জাবহাতুন নুসরা এবং তার আমীর আল-জুলানীর উপর আরোপ করে তাদের সুস্পষ্ট দাবী হলো, আল-জুলানী তার আমীর আবু বকর আল-বাগদাদীর নির্দেশ অমান্য করেছে শরীয়তের দৃষ্টিতে যা মারাত্মক অন্যায়।

এই দাবী কিন্তু অত্যন্ত যৌক্তিক। আমীরের আনুগত্য করার কথা পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ নিজে আল্লাহ ও রাসুলের সাথে সাথে আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদীসে আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া জাহেলিয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমীর ইরাকী না সিরীয় তা বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং দেশে দেশে এভাবে ভাগ-বিভক্তি করাটাই একটা জাহেলিয়াত যা আমরা পূর্বে বলেছি। অতএব যদি সত্যিই এটা প্রমাণিত হয় যে, আবু বকর আল বাগদাদী আল-জুলানীর আমীর ছিলেন এবং তিনি তাকে নিজের সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আল-জুলানী আমীরের নির্দেশ অমান্য করে ফিতনার সৃষ্টি করেছে তবে সে ফিতনার দায়ভার অবশ্যই আল-জুলানী বহন করবে ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম বা তার আমীর আবু বকর আল বাগদাদী নন। এই ফিতনায় যত লোকই নিহত হোক সেটা

উল্লেখ করে আবু বকর আল-বাগদাদীকে দায়ী করা যাবে না। বরং যদি দায়ী করতেই হয় তবে আল-জুলানীকে দায়ী করতে হবে। আলী ﷺ এর সাথে মুয়াবিয়া ﷺ এবং অন্যান্যদের যেসব যুদ্ধ হয়েছিল তাতে নিহতদের দায়ভার কোনো ভাবেই আলী ﷺ এর উপর বর্তায় না যেহেতু তিনি ছিলেন বৈধ খলীফা আর অন্যরা ছিল বৈধ খলীফার সাথে বিদ্রহে লিপ্ত সম্প্রদায়।

কিন্তু সত্যিই কি আল-জুলানী আবু বকর আল বাগদাদীর হাতে বায়াত ছিলেন?

আবু বকর আল বাগদাদী যে বক্তব্যে জাবহাতুন নুসরাকে দাওলাতুল ইসলামের সাথে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন সেখানে সুস্পষ্টভাবে এমন দাবীই করেছেন। ৯ ই এপ্রিল ২০১৩ ইং তারিখে প্রকাশিত বক্তব্যে তিনি বলেন,

فلما وصل الحال في الشام إلى ما وصل من سفك للدماء، وانتهاك للأعراض، واستنجاد أهل الشام، وتخلي أهل الأرض عنهم: ما كان لنا إلا أن نهُب لنصرتهم، فانتدبنا الجولاني – وهو أحد جنودنا – ومعه مجموعة من أبنائنا، ودفعنا بهم من العراق إلى الشام، على أن يلتقوا بخلايانا في الشام، ووضعنا لهم الخطط، ورسمنا لهم سياسة العمل، ورفدناهم بما في بيت المال مناصفة في كل شهر، وأمددناهم بالرجال، ممن عركوا ساحة الجهاد وعركتهم من المهاجرين والأنصار، فأبلوا إلى جانب إخوانهم من أبناء الشام الغيارى أيما بلاء، وامتد نفوذ الدولة الإسلامية إلى الشام، ولم نعلن عنها لأسباب أمنية، وحتى يرى الناس حقيقة الدولة بعيدًا عن تشويه الإعلام وتزويره وتزييفه، وقد آن الأوان لنعلن أمام أهل الشام والعالم بأسره: أن جبهة النصرة ما هي إلا امتداد لدولة العراق الإسلامية وجزء منها، وقد عقدنا العزم بعد استخارة الله تعالى، واستشارة من نثق بدينهم وحكمتهم

যখন শামে রক্তপাত ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি শুরু হলো, এবং শামের লোকেরা সাহায্য প্রার্থনা করলো আর পৃথিবীর কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিলো না। তখন আমরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে না গিয়ে পারলাম না। তখন আমরা আমাদেরই একজন সৈনিক আল-জুলানীকে প্রেরণ করলাম। তার সাথে আমাদের কিছু লোক ছিল। তাদের ইরাক থেকে সিরিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল। যাতে তারা সিরিয়াতে যারা আমাদের সমর্থক ছিল তাদের সাথে মিলিত হয়। তাদের কর্মকান্ড ও কার্যপ্রনালী কি হবে সেটা আমরাই ঠিক করে দিয়েছিলাম। বায়তুল মালের অর্ধেক অংশ তাদের জন্য মাসিক নির্ধারন করেছিলাম। তাদেরকে আমরা আনসার ও মুজাহিরদের মধ্যে এমন কিছু লোক দিয়ে সহায়তা করেছিলাম যারা জিহাদের ময়দানে পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ছিল। তারা শামের সম্মানিত লোকদের সাথে একত্রিত হয়ে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। এভাবে শামে দাওলাতে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আমরা প্রকাশ্যে এসব ঘোষণা করি নি নিরাপত্তাজনিত কারণে এবং যাতে মানুষ

মিডিয়ার মিথ্যাচার ও বিকৃতির থেকে মুক্ত হয়ে দাওলাতে ইসলামের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এখন সময় হয়েছে বিশ্ববাসী এবং শামের অধিবাসীদের সামনে এটা ঘোষণা করার যে, জাবহাতুন নুসরা দাওলাতে ইসলামের একটি অংশ ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা সলাত আদায় করে এবং যাদের দ্বীন ও হিকমতের ব্যাপারে আমাদের আস্থা আছে ঐ সকল ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

এখানে আবু বকর আল-বাগদাদী সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, জাবহাতুন নুসরার আমীর আল-জুলানী তার অধীনস্ত একজন সৈনিক। এছাড়া জাবাতুন নুসরার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং সে সময় প্রকৃত সত্যটি গোপণ করার বিস্তারিত কারণ তিনি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু তিনি এক তরফাভাবে দাবী করলেই কি হবে? অবশ্যই নয়। এক পক্ষের কথার উপর ভিত্তি করে তো কখনও সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আমাদের দেখতে হবে আল-জুলানী কি বলেন। তিনি বায়াতের বিষয়টি স্বীকার করেন নাকি অস্বীকার করেন। জাবহাতুন নুসরার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে আবু বকর আল-বাগদাদী যে কৃতীত্ব দাবী করেছেন সেটাই বা কতটুকু সত্য?

পরের দিন তথা ১০ ই এপ্রিল ২০১৩ ইং তারিখে আবু বকর আল-বাগদাদীর উপরোক্ত বক্তব্যের উত্তরে আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানীর একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, পূর্বের বক্তব্যে আবু বকর আল-বাগদাদী যা কিছু দাবী করেছেন আল-জুলানী তার কোনো অংশকে অস্বীকার করেননি উল্টো নিজেই সেগুলো আবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন,

لقد دار حديث حول خطاب منسوب للشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله وذكر في الخطاب المنسوب للشيخ تبعية الجبهة لدولة العراق الاسلامية ثم الغي فيه اسم دولة العراق وجبهة النصرة واستبدالهما باسم واحد الدولة الاسلامية في العراق والشام لذا نحيط الناس علما أن قيادات الجبهة ومجلس شوراها والعبد الفقير المسئول العام لجبهة النصرة لم يكونوا علي علم بهذا الاعلان سوي ما سمعوه من وسائل الاعلام فإن كان الخطاب المنسوب حقيقة فإننا لم نستشر ولم نستأمر

শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদী হাফিজাহুল্লাহ এর নামে প্রকাশিত একটি বক্তব্য নিয়ে এখন কথা-বার্তা চলছে। শায়েখের নামে প্রকাশিত ঐ বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে জাবহাতুন নুসরা ইরাকের দাওলাতে ইসলামের আনুগত্বের অধীন। এরপর

সেখানে ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম এবং জাবহাতুন নুসরার নাম পরিবর্তন করে একত্রে ইরাক ও সিরিয়ার দাওলাতুল ইসলাম নাম নির্ধারন করা হয়েছে। একারণে আমি সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, জাবহাতুন নুসরার নেতৃস্থানীয়রা এবং পরামর্শ সভার সদস্যরা আর এই অধম বান্দা (তিনি নিজে) জাবহাতুন নুসরার আমীর আমরা কেউই এ ঘোষণা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। আমরা কেবলমাত্র মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জানতে পেরেছি। যদি এই বক্তব্যটি সত্যিই হয়ে থাকে তবে আমাদের নিকট কোনো পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করা হয় নি।

দেখা যাচ্ছে আবু বকর আল-বাগদাদীর বক্তব্যে যা কিছু এসেছে তার কোনো অংশের উপর আল-জুলানী কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন নি কেবল একটি বিষয় ছাড়া আর তা হলো, তাদের পরামর্শ ছাড়া এই ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছে। এমনকি জাবহাতুন নুসরা যে দাওলাতে ইসলামের আনুগত্যের অধীন সে বিষয়টিও আল-জূলানী উল্লেখ করেছেন। এরপরই আল-জুলানী এসব ইতিহাস বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

প্রথমেই তিনি বলেন,

واقول بالله مستعينا بعدما كشفت بعض الأوراق ......

যেহেতু এখন ইতিহাসের পাতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি বলব ....

এরপর তিনি জাবহাতুন নুসরা কিভাবে গঠিত হয় তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ইরাকে জিহাদ শুরু করার পর থেকেই তিনি দাওলাতুল ইসলামের সাথে থেকে জিহাদ করেছেন। এরপর তিনি ইরাকের মুজাহিদদের ভূয়সী প্রসংশা করেন। তিনি বলেন,

وقد علم الله جل في علاه أنّا ما رأينا من إخواننا في العراق إلا الخير العظيم من الجود والكرم وحسن الجوار وأن أفضالهم لا تعد ولا تحصى وهو دين لا يفارق أعناقنا ما حيينا

মহান আল্লাহ জানেন যে, আমরা আমাদের ইরাকের ভাইদের নিকট খারাপ কিছু পাই নি। কেবল প্রভূত কল্যাণ, সহোযোগিতা ও উত্তম অবস্থানই পেয়েছি। আর তাদের অবদান গুনে শেষ করার মতো নয়। এটা আমাদের কাঁধে এমন একটা ঋণ যা বেঁচে থাকা অবধি আমরা ভুলবো না।

তিনি এটাও বলেন যে, ইরাকে ইসলামের পতাকা উত্তোলন না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরতে চান নি কিন্তু শামে বিপ্লব শুরু করে তাদের সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসে।

অর্থাৎ শামে ফিরে জিহাদ করার ইচ্ছা জাগে।

এরপর তিনি বলেন,

ناهيكم عن عشرات بل مئات المهاجرين الذين قضَوا نحبهم من الشاميين وغيرهم فداءً لإعلاء كلمة الله تحت راية دولة العراق الإسلامية، ثم شرفني الله عز وجل بالتعرف على الشيخ البغدادي ذلك الشيخ الجليل الذي وفى لأهل الشام حقهم، ورد الدين مضاعفًا، وذاك بأن وافق على مشروع قد طرحناه إليه لنصرة أهلنا المستضعفين بأرض الشام، ثم أردفنا بشطر مال الدولة رغم أيام العسرة التي كانت تمر بهم، ثم وضع كامل ثقته بالعبد الفقير وخوّله بوضع السياسة والخطة، وأردفه ببعض الإخوة، وعلى قلَّتهم إلا أن الله عز وجل قد بارك فيهم وبجمعهم

শামের অধিবাসী এবং অন্যান্য মুজাহিদদের মধ্যে শত শত মুজাহিদ ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের পতাকাতলে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে শহীদ হয়েছে। এরপর আল্লাহ শায়েখ বাগদাদীর সাথে সাক্ষাত ঘটিয়ে আমাকে ধন্য করেন। সেই মহান শায়েখ যিনি শামের অধিবাসীদের পাওনা পরিশোধ করেছেন এবং তাদের ঋণের দ্বিগুণ বিনিময় প্রদান করেছেন। এটা এভাবে যে, আমরা শামের দূর্বল লোকদের সহযোগিতার যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি আমাদের দাওলার (ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের) অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে সহায়তা করেছেন। যদিও সে সময় তাদের কঠিন অবস্থা যাচ্ছিল। এরপর তিনি এই অধম বান্দার (আল-জুলানী নিজে) উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখেন এবং তার উপর পরিচালনা ও পরিকল্পণার ভার অর্পণ করেন। সম্পদের সাথে সাথে কিছু লোকও তিনি আমাদের সাথে দেন। যদিও তাদের সংখ্য ছিল অল্প কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে বরকত দিয়েছেন।

এ বর্ণনার সাথে আল-বাগদাদীর বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে। বায়তুল মালের অর্ধের সম্পদ দিয়ে এবং সৈনিক দিয়ে আল-জুলানীকে সহায়তা করার বিষয়ে দুজনের বক্তব্য একই। আল-জুলানী যে আল-বাগদাদীর অধীনস্ত সৈনিক এবং তিনিই যে তাকে দায়িত্ব দিয়ে শামে পাঠিয়েছেন এটাও আল-জুলানী নিজেই সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, শায়েখ বাগদাদী আমার উপর পরিপূর্ণ আস্তা রেখেছেন এবং আমার উপর পরিচালনা ও পরিকল্পণার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

কিন্তু আল-জুলানী কি সেই আস্থা রক্ষা করতে পেরেছেন? যে তাকে কঠিন সময়ে নিজের অর্ধেক সম্পদ আর নিজের সৈনিক দিয়ে সহায়তা করেছে তাকে তিনি কি প্রতিদান দিয়েছেন? ছোট ছোট পদক্ষেপ থেকে শুরু করে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাগাদাদী তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে জাবহাতুন নুসরাকে ভেঙে দিয়ে

ইরাক ও শামে বৃহত্তর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রতিউত্তরে আল-জুলানী বলেন,

وإني لأستجيب إذن لدعوة البغدادي –حفظه الله– بالارتقاء من الأدنى إلى الأعلى وأقول: هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجدّدها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري –حفظه الله-

শায়েখ বাগদাদি হাফেজাহুল্লাহ ছোট পদক্ষেপ থেকে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার যে ডাক দিয়েছেন আমি তাতে সাড়া দেবো। আমি ঘোষণা করছি এটা জাবহাতুন নুসরার সদস্য এবং তার আমীরের পক্ষ থেকে বায়াত যা নতুনভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে শায়েখ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর প্রতি।

এরপর তিনি বায়াতের সেই পরিচিত ও প্রশিদ্ধ শপথটি উচ্চারণ করেন,

نبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره ....

আমরা বায়াত হচ্ছি, শুনবো ও মানবো কঠিন হোক বা সহজ হোক ......

এর পূর্বে আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে বায়াত হওয়ার সময় নিশ্চয় তিনি একই শপথ পাঠ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে বায়াত ভঙ্গ করলেন আর নতুন একজন আমীরের হাতে বায়াতের ঘোষণা দিলেন। এভাবে তিনি তার মহান শায়েখ আল-বাগদাদীর অবদানের প্রতিদান দিলেন। তার মনে আঘাত দিলেন। আমি শায়েখ বাগদাদীর ডাকে সাড়া দেবো .... এভাবে শুরু করার পরই তার বায়াত ভঙ্গ করে আরেক জনের হাতে বায়াত হওয়ার মাধ্যমে তিনি এই আঘাতকে দ্বিগুন করলেন। আল-জুলানীর নতুন আমীর তার এই বায়াত সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এভাবে আল-বাগদাদীর অন্তরে আঘাত দেওয়ার কাজে তিনিও শরীক হয়েছেন কিন্তু কে জানে হয়তো একদিন তাকেও একই আঘাত পেতে হবে। যে একজনের বিশ্বাস ভঙ্গ করে সে যে অন্য একজনের বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না তা বলা যায় না।

আল-জাজিরার একটি অনুষ্ঠানে আল-জুলানি আরও স্পষ্টভাবে এ বায়াতের কথা স্বীকার করেছেন সেটা সামনে আসবে।

যাই হোক, নিরোপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল-জুলানী শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদীর অধীনে বায়াতবদ্ধ ছিলেন। আল-জুলানী নিজেই বারবার বায়াতের বিষয়টা স্বীকার করেছেন। তাহলে তিনি আমীরের আদেশ অমান্য করেছেন কেনো? আমরা তো জানি আমীরের আনুগত্য

করতে হয় যদিও তার নির্দেশ পছন্দ না হয়। যদি আমীর কাফির হয়ে না যায় বা পাপের কাজের নির্দেশ না দেয়। এর কোনোটিই কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু আবু বকর আল-বাগদাদী একজন মুসলিম বরং আল-জুলানীর ভাষ্য মতে তিনি একজন মহান শায়েখ আর দুটি দলকে একতাবদ্ধ করার ঘোষণা দেওয়া কোনো পাপের কাজ নয় বরং সেটাই মহান আল্লাহ ও তার রসুলের সুস্পষ্ট নির্দেশ। তবে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে শায়েখ আল-বাগদাদীর অবাধ্য হওয়া কি আল-জুলানীর জন্য বৈধ হয়?

আমীরের নির্দেশ তো জুলুম হলেও মানতে হয়। অথচ আল-জুলানী শায়েখ আল-বাগদাদীর ব্যাপারে জুলুমের অভিযোগও উত্থাপন করতে পারেন নি বরং কেবলই উত্তম সাক্ষ দিয়েছেন। তবে তার আদেশ অমান্য করার ব্যাপারে কেবল একটি অজুহাত পেশ করেছেন আর তা হলো,

فإننا لم نستشر ولم نستأمر

"আমাদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নি এবং মতামত নেওয়া হয় নি।"

পাঠককে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আল-জুলানী নিজে আল-বাগদাদীর নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারে এ ছাড়া ভিন্ন কোনো অজুহাত পেশ করে নি। তিনি বায়াতের বিষয়টি অস্বীকার করেন নি বরং স্বীকার করেছেন। আল-বাগদাদীর পক্ষ থেকে কোনো জুলুম নির্যাতন বা অন্যায় কাজ ঘটার অপবাদ দেন নি। শুধু বলেছেন আমাদের পরামর্শ নেওয়া হয় নি। অতএব, আল-জুলানীর এই অবাধ্যতা সঠিক হয়েছে কিনা সেটা নির্ণয় করতে হলে শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে পরামর্শ নেওয়া হয় নি এই অজুহাতে আমীরের নির্দেশ অমান্য করা যায় কি না সেটাই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। কাফিরদের মিডিয়াতে আল-বাগদাদী এবং তার ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে যেসব অপপ্রচার করা হয় সেগুলো এখানে ভুলে যেতে হবে যেহেতু আল-জুলানী কথার মধ্যেই সেগুলোর মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তিনি তো এগুলো অজুহাত হিসেবে উল্লেখ করেন নি বরং শায়েখ আল-বাগদাদী এবং তার অনুসারীদের সম্পর্কে উত্তম সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি নিজে যে তার অধীনস্ত এটাও স্বীকার করেছেন। আমরা ধরে নিচ্ছি পরবর্তীতে আল-বাগদাদী এবং তার অনুসারীদের আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আল-জুলানী যখন আল-বাগদাদীর বায়াত ভঙ্গ করে তখন তো তিনি উত্তম ছিলেন যেমনটি আল-জুলানী নিজেও স্বীকার করেছেন। তাহলে আল-জুলানী কেনো আল-বাগদাদীর নির্দেশ অমান্য করলো? এটা একটা কঠিন প্রশ্ন, যার উত্তর

আল-জুলানীকে অবশ্যই দিতে হবে যেহেতু এই অবাধ্যতার কারণে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে। আমীরের অবাধ্য হওয়া নিজেই একটা অপরাধ আর একারণে মুসলিমদের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হলে সেটা আরও মারাত্মক অপরাধ। এর দায়ভার অবশ্যই বৈধ আমীরের উপর বর্তায় না বরং বিদ্রোহী সৈনিকের উপর বর্তায়। তবে যদি গ্রহণযোগ্য ওযর থাকে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু আল-জুলানীর কি ওযর ছিল? এর উত্তরে তিনি নিজেই বলেন, "আমাদের পরামর্শ নেওয়া হয় নি।"

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন,

ثم إن دولة الإسلام في الشام تبنى بسواعد الجميع دون إقصاء أي طرف أساسي ممن شاركنا الجهاد والقتال في الشام، من الفصائل المجاهدة والشيوخ المعتبرين من أهل السنة وإخواننا المهاجرين، فضلاً عن إقصاء قيادات جبهة النصرة وشورتها

শামে যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তা সকলের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। শামে যেসব সংগঠন জিহাদে অংশগ্রহণ করছে এবং আহলে সুন্নার ওলামা-মাশায়েখ আর আমাদের মুহাজির ভাইদের পরামর্শ ছাড়া এটা করা যাবে না। তাহলে স্বয়ং জাবহাতুন নুসরার নেতৃস্থানীয় এবং তাদের পরামর্শসভার সদস্যদের বাদ দিয়ে এটা কিভাবে হতে পারে?

মোট কথা শামের রাষ্ট্র শামের জনগণের পরামর্শে হবে ইরাকের লোকদের এখানে কিছুই করার নেই। গণতন্ত্রপন্থী এবং দেশত্ববোধে বিশ্বাসী যে কারও নিকট আল-জুলানীর এই উক্তিটি চমৎকার মনে হবে। তারা একযোগে আবু বকর আল-বাগদাদী এবং তার দাওলাতুল ইসলামকে দোষারোপ করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা বলবে, তুমি বাপু ইরাকের লোক আমাদের খাস প্রতিবেশী। পারলে কিছু সহযোগিতা করবে কিন্তু ইরাক থেকে সিরিয়াতে এসে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করা তোমার অন্যায় হবে। বলাবাহুল্য যে গণতন্ত্র বা দেশত্ববোধের মূলনীতিতে এসব কথা সঠিক প্রমাণিত হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এসব চিন্তাধারা সুস্পষ্ট জাহেলীয়াত। বর্তমান যুগে দেশে-দেশে ও জাতি-গোত্রে বিভক্ত হয়ে মুসলিম উম্মাহ যে জাহেলীয়াতের মধ্যে আছে এটা তারই জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ।

পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে আমীরের নির্দেশকে মান্য করতে বলা হয়েছে যদিও সেটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় এবং যদিও আমীর নিজের উপর অন্য কাউকে বেশি প্রাধান্য দেন। আমি, আমার দল বা আমার দেশের লোকের পরামর্শ নেওয়া হয় নি তাই আমি আমীরের নির্দেশ মানবো না এটা সঠিক কথা নয়।

ইসলাম পরামর্শ নেওয়ার কথা বলে কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সবার পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে এটা ইসলামের নীতি নয়। বরং আমীর যে বিষয়ে যাকে বিশ্বস্ত মনে করেন তার নিকট পরামর্শ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন অধীনস্তরা সকলে সেটা মেনে চলবে এটাই ইসলামের নীতি। এমনকি আমীর ইচ্ছা করলে কোনো বিষয়ে কারও পরামর্শ ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। আবু বকর ﷛ এর খেলাফতকালে সবার পরামর্শ উপেক্ষা করে মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া, উমর ﷛ এর পক্ষ থেকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের মতো সেনাপতিকে অপসারণ করা ইত্যাদি ঘটনার উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে কেবল পরামর্শ নেওয়া হয়নি এই অজুহাতে আমীরের বৈধ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। যারা গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত আছে তাদের নিকট এই মাসয়ালা মোটেও অজানা নয়। তাই এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ উত্থাপন করা সঙ্গত মনে করছি না।

এখানে আরও একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল-জুলানী বলেছেন, শামের ইসলামী রাষ্ট্র শামের জিহাদী সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি শামে পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন যা বিশ্ব ব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়। আর শায়েখ বাগদাদী ইরাক ও শামে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এটাই ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক প্রক্রিয়া।

এরচেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হলো, শামে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল-জুলানী যেসব দলের অংশগ্রহণকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের বেশিরভাগই মুখে ইসলামের কথা বললেও কার্যত ইসলামের মূলনীতি থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে অনেকে সরাসরি স্বীকার করে যে, তারা বাশার আসাদের পর সিরিয়াতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এমনকি যারা মুখে বলে আমরা সিরিয়াতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং দাওলাতে ইসলাম থেকে সরে গিয়ে আল-জুলানী যাদের সাথে পরবর্তীতে জোট বেঁধে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন তাদের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। আর কেউ নয় স্বয়ং আল-জুলানী নিজেই এসব ত্রুটি বিচ্যুতির কথা স্বীকার করেছেন।

আল-জাজিরাতে ২৭ মে ২০১৫ ইং তারিখে বিলা হুদুদ নামে একটি অনুষ্ঠানে আল-জুলানীকে অতিথি করা হয়। মিসরী উপস্থাক আহমাদ মানসুর আল-জুলানীকে সরাসরি প্রশ্ন করে,

بعض فصائل جيش الفتح التي هي معكم في نفس التحالف الذي انتم فيه معروفه انها مرتبطه بجهات خارجيه وتتلقى الدعم الخارجي

যেসব সংগঠনের সাথে জোট বেধে আপনারা জায়শে ফাতহ গঠন করেছেন তাদের মধ্যে কিছু সংগঠনের ব্যাপারে সবাই জানে যে, তারা বহির্বিশ্বের বিভিন্ন মহলের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তারা বাহির হতে সাহায্য-সহযোগিতা পায়।

এই প্রশ্নের উত্তরে আল-জুলানী সুস্পষ্ট উত্তর দিয়ে বলেন, (نعم) অর্থাৎ হ্যাঁ।

এরপর জাবহাতুন নুসরা বহির্বিশ্ব থেকে কোনো সহযোগিতা পায় কিনা এবং তাদের ব্যয়ভার কোথা থেকে আসে সে বিষয়ে আল-জুলানীকে প্রশ্ন করলে, তিনি বহির্বিশ্ব থেকে যে কোনো প্রকার সাহায্য গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং দাবী করেন, কেবল গনিমত ও দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে জাবহাতুন নুসরার যাবতীয় ব্যায়ভার বহন করা হয়। বহির্বিশ্বের মুসলিমরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো দান-সদকা করলে সেটা গ্রহণ করা হয় কিন্তু কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থার নিকট থেকে জাবহাতুন নুসরা কোনো সহযোগিতা গ্রহণ করে না।

বহির্বিশ্ব থেকে কোনো সহযোগিতা কেনো কেনো গ্রহণ করবেন না এই প্রশ্ন করলে তিনি বিষয়টির যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

প্রথমেই তিনি বলেন,

الدعم ان كان مشروطاً هو دعم خطير جداً يتحول الى تسييس في المستقبل

সহযোগিতা যদি শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হয় তবে সেটা মারাত্মক ক্ষতিকর। পরবর্তিতে সেটা হয়তো (সহযোগিদের) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে পৌছাবে।

এরপর তিনি বলেন,

اولا ليس هناك دعم غير مشروط معظم هذه الفصائل يشترط عليها وليس بالضروره ان يقال لهم نحن نشترط عليكم ان تفعلو كذا او كذا احيانا ياتيهم توجيه من حيث لا يعلمون على سبيل المثال ضرورة الساحه ان تثار مثلا معركه في حلب فياتي الداعمون الى هذه الفصائل يقول نحن نرى مآسي حمص او مايجري في حمص فخذو هذا الدعم لفتح طريق الى حمص والحقيقه تكون الساحه بحاجه الى عملية في حلب وليس في حمص فهم يوجهو الفصائل في

هذا الاتجاه حتى يرتبو مثلاً شئناً سياسياً لتصالح او شيئ من ما يقوم به مبعوثين الامم المتحده في حلب فيصرفو هذه الفصائل عن معركة اساسية وربما تكون حمص هي التي تحتاجها الساحه فيصرفوهم عنها الى حلب فلذلك هذا نوع من الضغط وليس من شرط مباشر لكن هؤلاء الناس يعرفون كيف يتعاملو مع من يستغلون

প্রথম কথা হলো, শর্তবিহীন সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এসব জিহাদী সংগঠনের বেশিরভাগের উপরই শর্ত আরোপ করা হয়। এমন নয় যে সব সময় বলা হয়, সহযোগিতা করার জন্য শর্ত হলো, তোমাদের এই এই কাজ করতে হবে। কখনও কখনও শর্ত এমনভাবে আসে যে তারা বুঝতেও পারে না। উদাহরণস্বরুপ হয়তো জিহাদের স্বার্থে হালাবে যুদ্ধ শুরু করা একান্ত প্রয়োজন তখন সহযোগীরা বলল, আমরা তো হিমসের বেদনাদায়ক ঘটনা লক্ষ্য করছি বা হিমসে কি হচ্ছে দেখছি এই সহযোগিতা গ্রহণ করো আর হিমসের দিকে যে রাস্তা আছে তা বিজয় করো। প্রকৃতপক্ষে তখন হয়তো হালাবে যুদ্ধ করাটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, হিমসে নয়। এভাবে তারা ঐ সকল মুজাহিদদের (নিজেদের পছন্দমত) স্থানে মোতায়েন করে। এভাবে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে। অথবা জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা হালাবে যা করতে চায় সেটা যাতে সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা যোদ্ধাদের মূল যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখে। বিপরীতে কখনও হয়তো হিমসে যুদ্ধ করাটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন তারা তাদের হালাবের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সরাসরি শর্ত দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না যেহেতু এসব লোকেরা মানুষকে দিয়ে কিভাবে কাজ করিয়ে নিতে হয় তা জানে।

উপস্থাপক প্রশ্ন করে, যেখানে অন্যান্য জিহাদী সংগঠনসমূহ বহির্বিশ্বের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারছে না সেখানে আপনারা কিভাবে এটা করছেন? তিনি বলেন,

المشكلة ان هذه الفصائل هي بنيت على هذا الاساس هي اعتمدت على الدعم الذي ياتيها من الخارج

মুল সমস্যা হলো, এসব জিহাদী সংগঠন এই মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহির্বিশ্ব থেকে তাদের নিকট যে সহযোগিতা আসে তারা তার উপরই নির্ভরশীল।

অর্থাৎ এসব দলের লোকেরা নিজেদের বাতিল পন্থা পদ্ধতির উপর অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্যণীয় যে, জাবহাতুন নুসরা এসব জিহাদী সংগঠনের এই ধ্বংসাত্মক নীতি সংশোধন করার পরিবর্তে তাদের এই ত্রুটি বিচ্যুতি মেনে নিয়েই তাদের সাথে জোট বদ্ধ হয়েছে। এ সত্ত্বেও জোটের কোনো কোনো শরীক বৈদেশিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে প্রায়ই জাবহাতুন নুসরাকে জোট থেকে বাদ দেওয়ার দাবী করে।

এক দিকে এসব দল যেমন এধরনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অন্য দিকে তারা

শরীয়তের মূলনীতি থেকে দূরে।

উক্ত অনুষ্ঠানেই উপস্থাপক আল-জুলানীকে প্রশ্ন করে,

اطلعت على تقارير كثيره حديثه خلال الايام الماضيه ان كثير من هذه الفصائل المتحالفه معكم في جيش الفتح يضغط عليها الان لاخراج جبهة النصرة او التخارج معها حتى يستمر الدعم الخارجي؟

আমি পূর্বে এমন অনেক তথ্য পেয়েছি যে, আপনাদের সাথে জোটভূক্ত অনেক দল এখন জোটের নেতাদের চাপ দিচ্ছে জাবহাতুন নুসরাকে জোট থেকে বাদ দেওয়ার জন্য। যাতে বহির্বিশ্বের সহযোগিতা অব্যাহত থাকে।

আল-জুলানী বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেন, (لا يستطيعون) তারা আমাদের বাদ দিতে পারবে না। এরপর শামের জিহাদের জাবহাতুন নুসরার ভূমিকা তুলে ধরেন। যাতে প্রমাণিত হয় শামে জিহাদ চালিয়ে যেতে হলে জাবহাতুন নুসরার প্রয়োজন রয়েছে অতএব ঐ সকল জিহাদী সংগঠনের পক্ষে জাবহাতুন নুসরাকে জোট থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব নয়।

এরপর তিনি বলেন,

وكثير من الفصائل الصادقه حتى وان كان بعض القيادات اصابها شيئ من الوساوس فتنازلت عن بعض مابادئها فجنود كثير من هذه الفصائل وقياداتهم العسكرية ملتزمون معنا بفضل الله عز وجل

অনেক সত্যপন্থী জিহাদী সংগঠন রয়েছে যদিও তাদের নেতৃস্থানীয়রা শয়তানের কুমন্ত্রনার শিকারে পরিনত হয়ে তাদের কিছু আদর্শ বিসর্জন দিয়েছে তবে এসব সংগঠনের অনেক সাধারন সৈনিক ও সেনা কমান্ডারদের আমাদের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল-জূলানী শামে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এসব সংগঠনের পরামর্শ গ্রহণ শর্ত করেছেন এবং সত্যিকার অর্থে যারা ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছে।

মজার ব্যাপার হলো, দাওলাতুল ইসলামের সাথে বিরোধ, আজ-জাওয়াহেরীর মিমাংসা এবং দাওলাতের ইসলামের পক্ষ থেকে সেটা অমান্য করার প্রায় ছয় মাস পর ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আল-জাজিরার আল-জূলানীর একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। তিনি শামের ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত রাখতে চান কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন,

نحن لا نسعي لنحكم البلاد بل نسعي لتحكم الشريعة في البلاد سواء كنا نحن حكام أو لم نكن حكام هذا لا يهمنا هذا الأمر الذي يهمنا في الأمر أن تحكم الشريعة ويسود العدل ويرفع الظلم عن الناس وتقام حكومة اسلامية راشدة علي منهاج النبوة تسعي لتحرير ديار المسلمين

আমরা এ দেশে রাজত্ব করার জন্য লড়াই করছি না বরং লড়াই করছি এখানে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমরা শাসক হই বা না হই যেটা কোনো বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শরীয়ত কায়েম হওয়া, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া, মানুষের উপর জুলুম বন্ধ হওয়া এবং নবুয়তের আদলে একটি সঠিক ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়া। যা অন্যান্য মুসলিম দেশ সমূহকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করবে।

এই সাক্ষাতকারটির শেষের দিকে দাওলাতুল ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন এ বিষয়ে তিনি বলেন,

نحن في اختصار شديد هناك وقع خلاف يقع بين الإخوة في البيت الواحد

সংক্ষেপে কথা হলো, এটা একই ঘরের মধ্য (নিজেদের মধ্যে) একটা বিরোধ।

এরপর ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন। ঘটনাটা অতি সামান্য মিডিয়া এটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করেছে।

আল-জূলানীর এসব কথা-বার্তার উপর পাঠককে সামান্য চিন্তা গবেষণা করার আহ্বান জানাচ্ছি। যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা চায় না বরং যেভাবেই হোক বা যার মাধ্যমেই হোক শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই চায়। সেই ব্যক্তি নিজেই যাদের সম্পর্কে বারবার উত্তম সাক্ষ্য দিয়েছে এবং যারা নিজেদের অধিকৃত এলাকায় আগেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাগুতের সহযোগী এবং তাগুতের মদদপুষ্ট নামধারী জিহাদী সংগঠনগুলোর সাথে জোট গঠন করে কোন যুক্তিতে!

সত্যিই যদি তিনি নির্দিষ্ট কোনো দলের বা নির্দিষ্ট কোনো দেশের লোকের শাসন ক্ষমতার নয় বরং যে কেউ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করুক এটাই চান তবে এ উদ্দেশ্যে দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুক্ত থাকাই কি অধিক সঙ্গত ছিল না? সত্যিই যদি তিনি শামে এমন একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান যে রাষ্ট্র অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে মুক্ত করবে তবে ইরাকে যে ইসলামী রাষ্ট্র আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যারা শামকে তাগুতের অধীন থেকে মুক্ত করতে এসেছে তাদের সাথে কাজ

করতে অস্বীকার করলেন কেনো? অথচ তার ভাষ্য মতে তারা অতি উত্তম মানুষ এবং একই ঘরের লোক।

নাকি এগুলো তার মুখের বুলি মাত্র? যখন প্রয়োজন হয় এগুলো বলে মুসলিম যুবকদের সন্তুষ্ট করেন আবার যখন বিভ্রান্ত ও বিকৃত চিন্তাধারার লোকদের সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন হয় তখন এসব কথা গোপন করেন বা অস্বীকার করেন? তার কার্যক্রমে কিন্তু এ ধরণের দ্বিমুখিতাই প্রকাশিত হয়।

এক বছর পরে আল-জাজিরাতে ২৭ মে ২০১৫ তারিখে বিলা হুদুদ নামক একটি প্রোগ্রামে আল-জুলানীর উদ্দেশ্যে মিশরী উপস্থাপক আহমাদ মানসুর প্রশ্ন করে,

هل ممكن ان تكون الشام ساحة لنقل المعركه بين جبهة النصرة وبين الغرب ؟

এমন কি সম্ভব যে, শামের ভূমি থেকে জাবহাতুন নুসরা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে?

উত্তরে আল-জুলানী বলেন,

بالنسبة لجبهة النصرة التوجيهات التي تأتينا من الدكتور ايمن حفظه الله هي ان جبهة النصرة مهمتها في الشام هي اسقاط النظام ورموزه وحلفاءه اقصد كحزب الله وغيرهوالتفاهم مع الفصائل لاقامة حكم اسلامي راشد ينعمون به اهل الاسلامونحن الارشادات التي اتتنا بعدم استخدام الشام كقاعدة انطلاق لهجمات غربية واوربيه لكي لا نشوش على المعركه الموجوده ربما تنظيم القاعده يفعل هذا لكن ليس من الشام

জাবহাতুন নুসরার ব্যাপারে কথা হলো, আয়মান আজ-জাওয়াহিরী হাফেজাহুল্লাহ এর নিকট থেকে আমাদের নিকট এই নির্দেশনা এসেছে যে, শামে আমাদের কাজ হলো এই সরকার এবং তার মিত্রদের যেমন হিযবুল্লাহ ও অন্যান্যদের পতন ঘটানো। আর অন্যান্য জিহাদী সংগঠনের সাথে মিলে-মিশে একটি সঠিক ইসলামী শাসন কায়েম করা। যেখানে মুসলিমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। আমাদের নিকট এই নির্দেশনা এসেছে যে, শাম থেকে যেনো পশ্চিমা বিশ্ব বা ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা না করা হয়। যাতে বর্তমান লড়াই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। হয়তো আল-কায়েদা পশ্চিমাদের সাথে লড়াই করবে কিন্তু শাম থেকে নয়।

এর দুই সপ্তাহ পর ১৩ ই জুন ২০১৫ ইং তারিখে উক্ত অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সিরিয়াতে লড়াই আশে-পাশের দেশে কোনো পরিবর্তন আনবে কিনা এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

كل مايحيط بدمشق من عواصم تتأثر طرداُ سلباً و إيجاباً بما سيجري في دمشق إن انتصر أهل السنة فيها فهذا نصر

سيعمم سيعمم ليس بالضرورة أن ندخل بجيوش إلى مناطق أخرى لست هذا اعنيه إنما هذه الشعوب ستعلم الطريق الصحيح للوصول إلى حريتها الحقيقة وتخلصها من عبودية هؤلاء الطواغيت والقضاء عليهم

দামেশকে (সিরিয়াতে) যা কিছুই ঘটবে সেটা ইতিবাচবক হোক বা নেতিবাচক হোক আশেপাশের দেশসমূহতে তার প্রভাব পড়বে। যদি এখানে আহলে সুন্নাহর অনুসারীরা বিজয়ী হয় তবে এ বিজয় আশে পাশে ছড়িয়ে পড়বে। এটা জরুরী নয় যে, আমরা (বিজয়ের পর সিরিয়া থেকে) সৈন্য বাহিনী নিয়ে ঐ সব এলাকাতে অভিযান চালাবো। এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং ঐ সব দেশের লোকেরা (আমাদের বিজয় দেখে) স্বাধীনতা অর্জন এবং তাগুতকে ধ্বংস করে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার সঠিক পথ শিখে নেবে।

দেখা যাচ্ছে আল-জুলানীরা সিরিয়াতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন তা আশেপাশের মুসলিম দেশে সরাসরি কোনো ভূমিকা রাখবে না বরং ঐ সকল দেশের লোকদের আল-জুলানীদের দেখে শিখে নিয়ে নিজের চেষ্টায় তাগুতের সাথে মুকাবিলা করতে হবে। অথচ একবছর আগে তিনি বলেছিলেন তিনি এমন একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান যা অন্যান্য মুসলিম দেশ সমূহ মুক্ত করতে চেষ্টা করবে।

এমন কেনো হলো আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক সেটা অনুধান করতে পারছেন। বাতিলপন্থীদের সাথে জোট গঠন করার কারণেই তিনি এখন এসব ইসলামী মূল্যবোধ ভুলে যেতে শুরু করেছেন। মাত্র এক বছরেই তাই তার এই অবনতি ঘটেছে। আরও কিছুদিন অতিবাহিত হলে অবস্থা কতদূর যাবে সেটা শুধু আল্লাহই জানেন। বাতিল পন্থীদের সাথে জোট বাধার পরিনাম এটাই।

মোট কথা আদর্শ থেকে বিচ্যুত, বহির্বিশ্বের তাগুতী শক্তির দ্বারা মদদপুষ্ট এবং তাদের স্বার্থে পরিচালিত যেসব নামধারী জিহাদী সংগঠন আছে আল-জুলানী তাদের সাথে জোট বেধে কাজ করছেন এবং শামে যে ইসলামী রাষ্ট্র হবে সেটা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ ও অংশগ্রহণ শর্ত হিসেবে গণ্য করছেন। কিন্তু ইরাকের মুজাহিদরা যাদের সম্পর্কে তিনি নিজেই উত্তম সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তিনি নিজেই তাদের অধীনে সাধারন সৈনিক হিসেবে ছিলেন। তাদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ ইরাক ও শাম মিলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন। এখানে তার সোজা যুক্তি হলো, শামের ইসলামী রাষ্ট্র শামের জিহাদী সংগঠনগুলোর পরামর্শে হতে হবে। যদিও তারা তাগুতের মদদপুষ্ট এবং তাগুতের দ্বারা পরিচালিত হয়। আর ইরাকের নেতৃত্ব অস্বীকার করতে হবে যদিও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়।

এখানে আমি পাঠককে বলব, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন তো রসুলুল্লাহ ﷺ কি এধরণের দেশপ্রীতিকেই বস্তাপচা জাহেলিয়াত হিসেবে গণ্য করেন নি?

অন্য কেউ স্বীকার করুক বা না করুক আমরা নিশ্চিত জানি যে এটা সুস্পষ্ট জাহেলিয়াত। এ ধরণের সুস্পষ্ট জাহেলী অজুহাতে স্বীয় আমিরের নির্দেশ অমান্য করার কারণে সত্যপন্থীদের নিকট আল-জুলানী অবাধ্য ও বায়াতভঙ্গকারী প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত হন। যদিও শামের জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই চাচ্ছিলেন আল-জুলানী এ ধরনের বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাক।

এই বিরোধের সময় সকলে তাকিয়ে ছিল আন্তর্জাতিক জিহাদী সংগঠন আল-কায়েদার আমীর শায়েখ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর সিদ্ধান্তের দিকে। যেহেতু তিনি সকল জিহাদীদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র এবং বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনুসরণীয়। তাছাড়া শায়েখ আল-বাগদাদীর বায়াত ভঙ্গ করে আল-জুলানী তার নিকট বায়াত হওয়ার মাধ্যমে এই বিরোধে তাকে জড়িয়ে ফেলেছিল। সবাই তাই অপেক্ষায় ছিল এই বায়াত তিনি গ্রহণ করেন না বর্জন করেন এবং সামগ্রিকভাবে কি সিদ্ধান্ত নেন সেটা দেখার জন্য। ইচ্ছা করলে তিনি খুব সহজেই এসব বিবাদের সমাধান করতে পারতেন। আল-জূলানী স্বীয় আমীরকে অমান্য করে আজ-জাওয়াহেরীকে যে বায়াত দিয়েছেন সে বায়াত গ্রহণ না করে আল-জূলানীকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়াটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হতো। এটা একদিকে শরীয়তের সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যেতো সেই সাথে মুজাহিদদের দুটি দলের মধ্যে বিরোধও মিটে যেতো। কিন্তু আল-জূলানীর বায়াত গ্রহণ করলে একদিকে আমীরের অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তাকে সহায়তা করা হয় এবং মুজাহিদদের মধ্যে সৃষ্ট এই বিরোধকে উসকে দেওয়া হয়।

এ সময় আবু বকর আল-বাগদাদী আজ-জাওয়াহেরীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে এসব ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন এবং আল-জূলানীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন। তিনি এ বিষয়েও আজ-জাওয়াহেরীকে সতর্ক করেন যে, কোনো ভাবে আল-জূলানীকে সমর্থন ও সহায়তা করলে সেটা ব্যাপক ফিতনার কারণ হবে। পরবর্তীতে শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরাক্ষা শিরোনামের বক্তব্যে আজ-জাওয়াহেরী এ পত্রের কথা স্বীকার করেছেন।

এ ধরণের প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত ঘটনার দুই মাস পর ৯ ই জুন ২০১৩ ইং তারিখে আল-কায়েদার আমীর শায়েখ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। যাতে তিনি এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেন।

প্রথমেই তিনি শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদী এবং আল-জুলানী উভয়কে সম্মানিত ভাই ও শ্রদ্ধেয় শায়েখ হিসেবে সম্মোধোন করে সালাম পেশ করেন। তারপর বিদ্যমান ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,

وما حدث من كلي الطرفين لم نستأشر ولم نستأمر بل ولم نخطر به وللأسف سمعناه وللأسف سمعناه من الإعلان كغيرنا

উভয় পক্ষের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে আমাদের নিকট পরামর্শ বা মতামত নেওয়া হয় নি। এমনকি ঘটনার পরও (দুটি দলের কারও পক্ষ থেকে) আমাদের জানানো হয় নি। দুঃখজনক হলো আমরা অন্যান্যদের মতো মিডিয়াতে বিষয়টি শুনেছি।

এরপর তিনি ক্রুসেডার, ইরানী আগ্রাসন ও রাফেজী ফিতনার মুকাবিলায় ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের ভূমিকাকে প্রসংশা করেন। তারপর শামের জিহাদে শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদীর সহযোগিতার কথা স্বীকার করে সেটার প্রসংশা করেন। এমন কি তিনি বলেন,

بل لقد أحببنا أحبابنا وإخواننا في جبهة النصرة من ثناء الشيخ أبي بكر البغدادي وإخوانه عليهم وعلي أميرهم الشيخ أبي محمد الجولاني

আমরা তো শায়েখ বাগদাদী এবং তার নিকটস্থ ব্যক্তিদের মুখে প্রসংশা শুনেই জাবহাতুন নুসরার ভাইদের এবং তাদের আমীর আল-জুলানীকে ভালবাসতে শুরু করেছি ।

এরপর তিনি শামে জিহাদ শুরু করা এবং এর মাধ্যমে মসজিদে আকসাকে স্বাধীন করে খেলাফত কায়েম করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখার জন্য প্রসংশা করেন।

এরপর তিনি বলেন,

ولا بد أن نذكر بالتقدير عرفانهم لإخوانهم في دولة العراق الإسلامية علي ما قدموهم من عون ومدد وتأييد

এছাড়া ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম তাদের জন্য যে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছে সেটা যে তারা স্বীকার করেছে এটাও আমি সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

এরপর তিনি খুরাসানের এবং তার বাইরের কিছু ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করে এবং আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করে এই দুটি সম্মানিত দলের মাঝে ফিতনার আগুন নিভিয়ে ফেলার জন্য যে সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হয়েছে সেটা শুনাতে শুরু করেন।

প্রথমেই বলেন,

أخطأ الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني بإعلانه دولة العراق والشام الإسلامية دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا بل ودون إخطارنا

শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদী আল-হুসাইনী আমাদের পরামর্শ ও মতামত না নিয়ে এমন কি আমাদের অবগত না করেই ইরাক ও শামে ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়ে ভুল করেছেন।

এরপর তিনি বলেন,

أخطأ الشيخ أبو محمد الجولاني بإعلانه رفض دولة العراق والشام الإسلامية وإظهار علاقته بالقاعدة دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا بل ودون إخطارنا

শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানী আমাদের পরামর্শ ও মতামত না নিয়ে এমন কি আমাদের অবগত না করেই ইরাক ও শামে ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণাকে অস্বীকার করে এবং আল-কায়েদার সাথে তার সম্পর্ক প্রকাশ করে দিয়ে ভুল করেছেন।

এপর তিনি এ বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেন। যার সার কথা হলো, ইরাক ও শামের দাওলাতুল ইসলাম ভেঙে দেওয়া হবে এবং দুটি দল আগের মতো দুই নামে কাজ করবে। সেই সাথে আবু বকর আল-বাগদাদীর নেতৃত্বাধীন দাওলাতুল ইসলাম ইরাকে ফিরে যাবে আর জাবহাতুন নুসরা শামে থেকে যাবে। উভয় দল আল-কায়েদার অধীনে থাকবে এবং উভয় দলের বর্তমান আমীর এক বছরের জন্য বহাল থাকবে। একবছর পর উভয় দলের মজলিসে শুরা নিজ নিজ আমীর সম্পর্কে আল-কায়েদার উর্ধ্বতন নেতৃত্বকে অবহিত করলে তারা তাদের পরিবর্তন বা বহাল রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এরপর তিনি ঘোষণা করেন, যদি কোনো মুজাহিদ একটি গ্রুপ থেকে অন্য গ্রুপে যোগ দেয় তবে তাকে খারেজী বলা যায় না। একারণে তার রক্ত ঝরানোও বৈধ হয় না। যদিও তার এ কাজ সঠিক নয়।

সব শেষে, আয়মান আজ-জাওয়াহেরী আবু খালিদ আস-সুরীকে দুই দলের মুজাহিদদের মধ্যে কোনো বিবাদ হলে শারয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করে মিমাংসা করার দায়িত্ব দেন।

সব শেষে এই রায়ের কপি দাওলাতুল ইসলাম, জাবহাতুন নুসরা এবং আবু খালিদ

আস-সুরীর নিকট প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।

এর কয়েকদিন পর ১৫ জুন ২০১৩ ইং তারিখে শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদী আজ-জাওয়াহেরীর এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে 'ইরাক ও শামের দাওলাতুল ইসলাম টিকে থাকবে' এই শিরোনামে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন,

إن الدولة الإسلامية في العراق والشام باقية ما دام فينا عرق ينبض أوعين تطرف باقية ولن نساوم عليها أو نتنازل عنها حتي يظهرها الله تعالي أو نهلك دونها دولة مهد لها الشيخ أبو مصعب الزرقاوي وامتزجت بدماء مشايخنا أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر لن تنحصر عن بقعة امتدت اليها ولن تنكمش بعد نموها بإذن الله تعالي وتوفيقه ومنه والحدود التي رسمتها الأيادي الخبيثة بين بلاد الاسلام لتحجم حركتنا وتقوقعنا في داخلها قد تجاوزناها ونحن عاملون بإن الله تعالي علي لإزالتها ولن يتوقف هذا الزحف المبارك حتي ندق آخر مسمار في نعش مؤامرة سيكس وبيكو

নিশ্চয় দাওলাতে ইসলাম ইরাকে ও শামে টিকে থাকবে, যতক্ষণ আমাদের শিরায় রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আমাদের চোখের পাতা আন্দোলিত হয়। টিকে থাকবে। আর আমরা এ ব্যাপারে কোনো আপোস করবো না, কোনো ছাড়ও দেবো না। যতক্ষণ না আল্লাহ এটাকে বিজয়ী করেন অথবা এর জন্য আমাদের জীবন চলে যায়। এই দাওলাত যা প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন আবু মুসয়াব আজ-জারকাবী আর আমাদের মাশায়েখ আবু উমর আল-বাগদাদী এবং আবু হামযা আল-মুহাজির এর রক্তে তা সিঞ্চিত হয়েছে। দাওলাতে ইসলাম যেসব ভূমিতে বিস্তৃত হয়েছে তার কোনো অংশ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না। এটা বৃদ্ধি পাওয়ার পর আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আর সংকুচিত হবে না। আর অপরাধী চক্র মুসলিমদের ভূখন্ডকে যেসব সীমানায় বিভক্ত করেছে আমাদের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এবং আমাদের তার মধ্যে পিশে মারার জন্য আমরা সেগুলো মানি না। বরং আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় সেগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য সংগ্রাম করছি। আর এই চক্রান্তের কবরে শেষ মাটি না দেওয়া পর্যন্ত এ অভিযান বন্ধ হবে না।

এরপর তিনি বলেন,

أما الرِسالةُ التي نُسِبَت إلى الشَيخ أيمَن الضَواهِري حَفِظَهُ الله، فإن لَنا عَليها مؤاخَذاتٍ شَرعية ومَنهَجيةٍ عَديدة، وقَد خُيّرَ العَبدُ الفَقير بَينَ أمرِ رَبه المُستَفيض، وبينَ الأمر المُخالِف لأمر الله تَعالى، وبَعد مُشاورة مَجلِس شُورى الدَولة الاسلاميةِ في العِراق والشام مِن مُهاجِرين وأنصار، ومِن ثَمّ إحالة الأمر إلى الهَيئة الشَرعية اخترتُ أمر رَبي عَلى الأمر المخالِف لهُ في الرِسالة

শায়েখ আয়মান আজ-জাওয়াহেরী এর নামে যে বক্তব্যটি বের হয়েছে তার উপর শারয়ী দৃষ্টিকোন থেকে এবং আদর্শগতভাবে আমাদের বেশ কিছু আপত্তি আছে। এই অধম বান্দার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, হয়তো মহান আল্লাহর অকাট্য বিধান মেনে চলা অথবা আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী এই নির্দেশটি মেনে নেওয়া। তাই আনসার ও মুহাজিররদের সমন্বয়ে গঠিত ইরাক ও শামের দাওলাতে ইসলামের মজলিসে শুরা এবং তার পর শরয়ী বোর্ডের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করে আমি আল্লাহর বিধানের বিরোধী এই নির্দেশটি পরিত্যাগ করে আমার রবের নির্দেশকেই গ্রহণ করেছি।

এরপর তিনি আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও একটি হাদীস পেশ করেন।

তারপর তার সৈনিকদের ইরাক ও শামে সর্বাত্মক যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। সব শেষে মুসলিম বিশ্বের যুবকদের শামে হিজরত করে আসতে উৎসাহিত করেন। তাদের বলেন,

هلموا الي دولتكم لتعلوا صرحها

তোমরা তোমাদের দেশে চলে এসো এবং তা প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণ করো।

এই বক্তব্যের কয়েকদিন পর ২০ জুন ২০১৩ ইং তারিখে "তাদের ছেড়ে দাও যত খুশি মিথ্যা বলুক" (ذرهم وما يفترون) এই শিরোনামে দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানীর একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি দাওলাতুল ইসলাম সম্পর্কে মানুষ যা কিছু আপত্তি অভিযোগ উত্থাপন করে সেগুলোর জবাব দেন। তার মধ্যে আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও কথা বলেন। এ বিষয়ে দাওলাতুল ইসলামের আমীর সংক্ষেপে যা বলেছেন আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী প্রায় একই কথা বলেন। তবে তিনি এসব বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

প্রথমেই তিনি বলেন,

أولا أن في الرسالة أمرا يؤدي إلى معصية , ألا وهي تفريق صف فئة من أكبر فئات المسلمين المجاهدة على وجه الأرض

এই পত্রটির মধ্যে একটি বিষয় রয়েছে যা পাপের দিকে নিয়ে যায় তা হলো পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান বড় মুজাহিদ দলগুলোর মধ্যে একটি দলকে বিভক্ত করে দেওয়া।

এর পর তিনি মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত না হয়ে একতাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেন। তারপর আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত না মানার ব্যাপারে বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ উত্থাপন করেন। যেমন,

— শামের অনেক মুজাহিদ জাবহাতুন নুসরার কার্যক্রমকে পছন্দ করে না। দাওলাতুল ইসলাম শামে আসার পর থেকে তারা দাওলাতুল ইসলামের সাথে যোগ দিয়ে কাজ করে। দাওলাতুল ইসলাম যদি ইরাকে ফিরে যায় তবে তারা জাবহাতুন নুসরায় যোগ দেবে না বরং হয়তো নিষ্ক্রয় হয়ে যাবে অথবা ভিন্ন কোনো দল গঠন করবে এভাবে মুজাহিদরা আরও বিভক্ত হয়ে পড়বে। এভাবে একটি দলকে বিভক্তির মুখে ঠেলে দেওয়া কি বৈধ?

— প্রচলিত সীমানা মেনে নিয়ে মুজাহিদদের দুটি ভাগে ভাগ করাটা এই সীমানাকে বৈধতা দেওয়া হিসেবে গণ্য। অথচ এই সীমানা কাফিরদের চাক্রান্ত যা মুসলিমদের দূর্বল করার জন্য অংকন করা হয়েছে। আর ইসলাম এসব অবৈধ সীমানাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না।

— এই সিদ্ধান্তে মুজাহিদদের বিভক্ত করা হয়েছে কেবল তাই নয় বরং যারা আমীরের নির্দেশ অমান্য করে বিভক্ত হয়েছে তাদের প্রতি সমর্থন দেওয়া হয়েছে। এমন কি তারা যা চায় অর্থাৎ শামের নেতৃত্ব তাদের সেটা প্রদান করা হয়েছে। এভাবে অন্য যে কেউ নেতার আনুগত্যের বাইরে স্বাধীন দল গঠন করতে চায় তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

— এই বক্তব্যে বলা হয়েছে উভয় দলই ভুল করেছে কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দলের ভুল হলো ইজতিহাদী ভুল যা ভুল হলে একটি সওয়াব ঠিক হলে দুটি সওয়াব আর অন্য দলের ভুল হলো সুস্পষ্ট পাপ। (যেহেতু প্রথম ব্যক্তি আমীর আর পরের জন মা'মুর তথা অধীনস্ত। ইসলামে নিয়ম হলো আমীর ইজতিহাদ তথা চিন্তা ভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত দেবে অধীনস্ত মা'মুররা সুস্পষ্ট পাপ কাজ না হলে তা মেনে চলবে। আমীর ভুলের উর্ধে নয় অতএব, তার সিদ্ধান্ত কখনও কৌশলগতভাবে ভুল হতে পারে কিন্তু তাতে তার পাপ হবে না। তবে সুস্পষ্ট পাপের কাজ না হলে আমীরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলে পাপ হবে। এখানে আল-বাগদাদী আল-জাওলানীর আমীর অতএব তার সিদ্ধান্ত যদি কৌশলগতভাবে ভুলও হয় তবু তিনি পাপী হবেন না কিন্তু তার নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল-জুলানী অপরাধী।)

অথচ এই অপরাধীকেই শামের কর্তৃত্ব প্রদান করে পুরষ্কৃত করা হয়েছে আর যিনি

সত্যপন্থী তার হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে জুলুম।

— শাম থেকে দাওলাতুল ইসলাম যদি ফিরে আসে তবে যেসব এলাকা তারা দখল করে ছিল এবং যেখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছিল সেগুলোর কিছু অংশ তাগুত সরকারের হাতে বেদখল হয়ে গেলে সে পাপের বোঝা কে বহন করবে?

— এখানে একজন বিচারক দুটি দলের মধ্যে রায় ঘোষণা করছেন কিন্তু তাদের কাউকে তিনি সরাসরি দেখেন নি। তিনি কাদের সাক্ষের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করছেন সেটাও আমরা জানি না। ঐ সকল সাক্ষীরা আমাদের বিপক্ষের লোক কিনা বা খেয়ানতকারী কিনা সেটা নিশ্চিত নয়। এভাবে পত্র মারফত কোনো ব্যাপারে অবগত হয়ে কারও সম্পর্কে রায় ঘোষণা করা বৈধ হয় কি?

— আমাদের শাম থেকে দূরে সরে যেতে বলা হচ্ছে অথচ (হাদীসে শামের ফজিলত বর্ণিত হওয়ার কারণে) মুজাহিদরা সর্বাবস্থায় শামে জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে।

— আমরা প্রাচীরের ঐপাশে (ইরাকে) বসে থেকে শামের অধিবাসীদের উপর যেসব জুলুম নির্যাতন হচ্ছে সেগুলো দেখে কিভাবে নিরবে সহ্য করবো?

সামান্য চিন্তা করলে দেখা যাবে আবু বকর আল-বাগদাদী বা তার মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী যেসব আপত্তি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার সবই শরয়ী দলীল প্রমাণের আলোকে পেশ করেছেন। তার মধ্যে কোনটিই আল-জুলানীর কথা “শামের লোকের পরামর্শ নেওয়া হয়নি তাই আমীরের নির্দেশ মানবো না” এরকম জাহেলী বক্তব্য নয়। কিন্তু এসব যুক্তি-প্রমাণের দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করে নি। কেবল আজ-জাওয়াহেরীর সিদ্ধান্তকে অমান্য করার কারণে সবাই দাওলাতুল ইসলামের নিন্দা করার ব্যাপারে নতুনভাবে সোচ্চার হয়। এতদিনে তারা আল-জুলানীকে আমীরের অবাধ্য হওয়ার দায় থেকে বাঁচানোর একটা মওকা পেয়ে যায়। সবাই একযোগে বলতে থাকে আবু বকর আল-বাগদাদী তার আমীর আজ-জাওয়াহেরীর নির্দেশ অমান্য করেছে। অতএব আল-জুলানী নয় বরং তিনিই আমীরের অবাধ্য। এভাবে যুক্তির তীর তার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত আল-জুলানীর ও আল-কায়েদার সমর্থকরা এই যুক্তিটিকে শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদীর বিপক্ষে ব্যবহার করে থাকে। সত্যি সত্যিই আবু বকর আল-বাগদাদী আয়মান আজ-

জাওয়াহেরীর নিকট বায়াত ছিলেন কিনা এ প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করে নি। সবাই অন্ধের মতো কেবল অপবাদই রটিয়ে গেছে। এমন কি খোদ আল-জুলানী নিজেই এই যুক্তিটি ব্যবহার করেছেন।

১৩ জুন ২০১৫ ইং তারিখে আল-জাজিরাতে বিলা হুদুদ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আল-জুলানীকে আহমাদ মানসুর সরাসরি প্রশ্ন করে,

— আপনি কি আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে বায়াত হয়েছিলেন?

আল-জুলানী বলেন,

, لم أضع يدي في يد أبو بكر البغدادي الاما .. عندما قال في عنقي بيعه إلى الدكتور أيمن

আমি আল-বাগদাদীর হাতে কেবল তখন হাত দিয়েছি যখন তিনি বলেছেন আমার কাঁধে ডঃ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর বায়াত রয়েছে .....

وعلى هذا بايعناه , ثم هم فيما بعد لما حدث الخلاف وفصل الدكتور أيمن وأمرهم بالعودة إلى العراق فتنكروا لهذه البيعة واتهمونا نحن

এর উপর ভিত্তি করেই আমরা তার নিকট বায়াত হয়েছিলাম। এরপর যখন মতপার্থক্য শুরু হলো। যখন ডঃ আয়মান আজ-জাওয়াহেরী তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করলেন তাদের বললেন ইরাকে ফিরে যেতে তারা এই বায়াত অস্বীকার করলো। আর আমাদের বায়াত ভঙ্গ করার অপবাদ দিলো।

এ তথ্য সত্য কিনা সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় এ দাবী সত্য তবে কি আল-জুলানী আমীরের অবাধ্য হওয়া এবং এর মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টি করার অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে যান? অন্তত আল-জুলানী এবং তার সমর্থকরা এমনটাই মনে করে। মজার ব্যাপার হলো, আসল ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো।

ধরে নিই সত্যি সত্যিই আবু বকর আল-বাগদাদী আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর হাতে বায়াত ছিলেন অর্থাৎ আল-বাগদাদী জাওয়াহেরীর পক্ষ থেকেই ইরাক ও শামের উপর আমীর নিযুক্ত ছিলেন। এরপর ৯ জুন ২০১৩ ইং তারিখে আয়মান আজ-জাওয়াহেরী যখন তাকে সদলবলে ইরাকে ফিরে যেতে বলেন তখন সে বায়াত ভঙ্গ করেন। এ হিসেবে এর দুই মাস আগে ৯ ই এপ্রিল ২০১৩ ইং তারিখে যখন আবু বকর আল-বাগাদাদি আল-জুলানীকে নিজের সাথে একতাবদ্ধ করার ঘোষণা দেন তখনও তিনি আজ-জাওয়াহেরীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীর। যেহেতু তখনও তিনি জাওয়াহেরীর

বায়াত ভঙ্গ করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল-জুলানী আবু বকর আল-বাগদাদির ডাকে সাড়া দেয় নি। অর্থাৎ তিনি তার মহান শায়েখ ডঃ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীরের অবাধ্য হয়েছেন এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ং আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর অবাধ্য হয়েছেন। যেহেতু কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত কোনো স্থানীয় আমীরের অবাধ্য হলে মূলত কেন্দ্রকেই অবমাননা করা হয়। একারণে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

যে কেউ আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে কেউ আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীরের অবাধ্য হয় সে আমার অবাধ্য হয়।

[বুখারী ও মুসলিম]

স্মরণ রাখতে হবে যে, আল-জুলানী স্থানীয় আমীর আবু বকর আল-বাগাদদীর নির্দেশ অমান্য করার সময় কেন্দ্রীয় আমীর আজ-জাওয়াহেরীর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেননি এমনকি তাকে অবহিত পর্যন্ত করেননি। যেহেতু আমরা পূর্বে দেখেছি আজ-জাওয়াহেরী নিজেই বলেছেন, আল-জুলানী তার নিকট কোনোরুপ পরমর্শ, মতামত ছাড়াই এমন কি তাকে না জানিয়েই আবু বকর আল-বাগদাদির সিদ্ধান্তকে অমান্য করেছেনা। অর্থাৎ আল-জূলানী কেন্দ্রীয় আমীরের সাথে পরামর্শ না করেই কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত আমীরের অবাধ্য হয়েছেন। আর বলাই বাহুল্য যে, এর মাধ্যমে একই সাথে স্থানীয় আমীর ও কেন্দ্রীয় আমীর উভয়কে অমান্য করা হয়।

দেখা যাচ্ছে আমীর অমান্য করার দায়ভার আল-জুলানী কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। দুই মাস পরে একজন আমীরের বায়াত ভঙ্গ করবে তাই দুই মাস আগেই আমি তার বায়াত ভঙ্গ করেছি এটা অবশ্যই অযৌক্তিক। আরও বেশি অযৌক্তিক যদি আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীরকে কেউ অমান্য করে তার থেকে স্বাধীন হতে চায়। আর আমি তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তার পক্ষ নিয়ে এবং তার দাবী পুরণ করে পুরুষ্কৃত করি। এধরণের আরও অনেক অযৌক্তিক বিষয় সামনে আসবে আল-জুলানী এবং তার নতুন আমীর যাতে লিপ্ত হয়েছেন।

এখানে পাঠককে আমি আরও একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবো। যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, আজ-জাওয়াহেরী আবু বকর আল-বাগদাদীর আমীর ছিলেন তবু তার নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে আল-বাগাদাদি যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছেন তার সাথে আল-জুলানীর উত্থাপিত যুক্তির আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু আজ-

জাওয়াহেরীর নির্দেশের মধ্যে শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে বহু সংখ্যক অগ্রহণযোগ্য বিষয় রয়েছে। আর রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই। আয়মান আজ-জাওয়াহেরী একটি মুসলিম দলকে দুটি ভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের দখলকৃত ভূমি অরক্ষিত রেখে মুজাহিদদের চলে যেতে বলেছেন, বাহ্যিকভাবে হলেও তাগুতের আঁকা সীমানা মেনে নিতে বলেছেন এসকল কাজের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে আল-বাগদাদী তার নির্দেশ অমান্য করেছেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরণের স্পষ্ট ভুল সিদ্ধান্ত নিলে আমীরের নির্দেশ অমান্য করা যায় যেহেতু আমীর নিয়োগ করা হয় শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শরীয়তকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নয়। বিপরীত দিকে আল-বাগদাদী মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ করা, তাগুতের আঁকা সীমানা প্রাচীর উপেক্ষা করে এক দেশ থেকে হিজরত করে অন্য দেশের মুসলিমদের সহায়তা করা ইত্যাদি উত্তম কাজের নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু আল-জুলানী কোনো শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে কেবল তাদের নিকট পরামর্শ নেওয়া হয় নি বা শামের লোকের পরামর্শ ছাড়া শামে কোনো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এমন জাহেলী যুক্তিতে তার নির্দেশের অবাধ্য হয়েছেন। অতএব, উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

দেখা যাচ্ছে আবু বকর আল-বাগাদাদী আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর নিকট বায়াতবদ্ধ এটা প্রমাণিত হলেও শামের ফিতনার দায়ভার আল-জুলানীর উপরই বর্তায়। তাহলে কেমন হবে যদি প্রমাণিত হয় আবু বকর আল-বাগদাদী আদৌ জাওয়াহেরীর নিকট বায়াত ছিলেন না!

দাওলাতে ইসলাম কি আল-কায়েদার অধীনে বায়াতবদ্ধ ছিল?

এখন এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আল-জুলানীর সাথে সাথে এমন কি ডঃ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীও দাবী করছেন দাওলাতুল ইসলাম গোড়া থেকেই আল-কায়েদার হাতে বায়াত বদ্ধ ছিল। এটা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন নথিপত্র ঘেটে হাস্যকর পন্থায় কষ্টকর পরিশ্রম করে চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন। অথচ পূর্বে তিনি নিজেই সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদা বা মোল্লা ওমরের হাতে বায়াত নয়। তবে কি তিনি তখন মিথ্যা বলেছেন? না কি এখন মিথ্যা বলছেন? নাকি এখানে কোনো মারেফতের ভেদ আছে? ঘটনা যাই হোক আমরা এখন এ বিষয়ে সঠিক তথ্যটা উদঘাটনের চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আমরা আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর ঐ বক্তব্যটির দিকে পুনরায় নজর দেবো যেখানে তিনি জাবহাতুন নুসরা এবং দাওলাতুল ইসলামের মধ্যে মিমাংসা করেছেন। আবু বকর আল-বাগদাদীর ঘোষিত ইরাক ও শামে ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে তিনি দুটি দলকে আল-কায়েদার নেতৃত্বে পৃথক পৃথক দল হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং উভয় দলের আমীর পরিবর্তন করার দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ইরাকের দাওলাতুল ইসলামকে ঘরে ফিরে যেতে বলেছেন ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার হলো, এতকিছু সিদ্ধান্ত তিনি কিসের বলে ঘোষণা করছেন তা কিন্তু সম্পূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে কোথাও উল্লেখ করেন নি। গ্রন্থের শুরুতেই আমরা দেখেছি আবু বকর আল-বাগদাদী যখন জাবহাতুন নুসরাকে তার সাথে একতাবদ্ধ করার ঘোষণা দেন প্রথমেই তিনি নিজের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। জাবহাতুন নুসরা প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা, আল-জূলানী যে তার অধীনস্ত সৈনিক এসব মৌলিক বিষয়ের সাথে সাথে প্রথমে কি কারণে এসব বিষয় গোপণ রাখা হয়েছিল সেসব তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এর ফলে জাবহাতুন নুসরাকে একতাবদ্ধ হওয়ার ডাক দেওয়াটা তার পক্ষে শোভা পায় কিনা সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ ধরণের একটা বড় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এটাই সঠিক পদ্ধতি।

কিন্তু আজ-জাওয়াহেরীর অবস্থা হয়েছে —"এসেছি ধান কাটতে, ভুলেছি কাস্তে আনতে।" তিনি ধান কাটতে এসেছেন কিন্তু যে জিনিসের বলে ধান কাটবেন তা আনতে ভুলে গেছেন। জাবহাতুন নুসরা স্বেচ্ছায় তার নিকট বায়াত দিয়েছে তিনি সে বায়াত গ্রহণ করে তাদের যা ইচ্ছে নির্দেশ দিতে পারেন কিন্তু ইরাকের দাওলাতে ইসলাম এবং তাদের আমীর আবু বকর আল বাগদাদীর উপর তিনি যে পাহাড় সমান সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন সেটা কিসের বলে দিয়েছেন? তিনি কি তার হাতে বায়াতবদ্ধ নাকি তার অনুগত সৈনিক? শামে জাবহাতুন নুসরাকে প্রেরণ করার সময় আজ-জাওয়াহেরীর কোনো ভূমিকা ছিল কিনা এসব কিছুই তিনি উল্লেখ করেন নি। এর ফলে তিনি যেসব সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন সেগুলো অনেকটা উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো মনে হয়।

তিনি শুধু বলেছেন, ইরাকের দাওলাতে ইসলাম এখন থেকে আল-কায়েদার স্বতন্ত্র শাখা বলে গণ্য হবে। কিন্তু কেনো তারা আল-কায়েদার অধীনে যোগ দেবে? এর পূর্বেই কি তারা আল-কায়েদার শাখা ছিল? সেটা এতদিন কেনো গোপন ছিল? এসব কিছুই তিনি বলেন নি।

অনেকে বলতে পারেন, ইরাকের দাওলাতে ইসলাম যে আল-কায়েদার হাতে বায়াত এটা সবাই জানে তাই উল্লেখ করেন নি। তাদের জ্ঞাতার্থে বলব, ঘটনা এমন নয়। জাওয়াহেরী যে বক্তব্যে আল কায়েদার নিকট ইরাকের দাওলাতে ইসলাম বায়াতবদ্ধ এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেখানেও এই বায়াত গোপনে ছিল এমন উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। এ ছাড়া আবু বকর আল-বাগদাদীর যে বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি এই সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন সেখানেও আবু বকর আল বাগদাদী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ইরাকের আল-কায়েদা দাওলাতে ইসলামের নিকট বায়াত হয়েছিল, দাওলাতে ইসলাম আল-কায়েদার নিকট নয়।

তিনি বলেন, ইরাকের মুজাহিদরা ক্রমে নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে। ঐ সকল স্তরের মধ্যে প্রথমে জারকাবীর পক্ষ থেকে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। তার পরের স্তরে আল-কায়েদার হাতে বায়াত হওয়া। তারপর আল-কায়েদা নামটি পরিত্যাগ করে মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ পরামর্শ সভা গঠন করা এবং সবার শেষে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। এই স্তরটিকেই তিনি চূড়ান্ত স্তর হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

أما في العراق فقد استكملوا مسيرة الرقي باعلانهم الدولة الاسلامية

এভাবে দাওলাতে ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) গঠন করার মাধ্যমে ইরাকে মুজাহিদরা চূড়ান্ত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইরাকের মুজাহিদরা একটি স্তরে আল-কায়েদার নিকট বায়াত বদ্ধ ছিল কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে দাওলাতুল ইসলাম গঠন করা হয়। এভাবে তারা চূড়ান্ত স্তরে উত্তীর্ণ হয়।

এ কথার মাধ্যমে বোঝা যায়, ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার নিকট বায়াত বদ্ধ নয়। এখন যদি জাওয়াহেরী মনে করেন আসলে দাওলাতে ইসলাম তার নিকট বায়াতবদ্ধ আর তার উপর ভরসা করেই এতগুলো সিদ্ধান্ত শুনিয়ে থাকেন তবে পূর্বেই এই বায়াত সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য করার প্রয়োজন ছিল অবশ্যই। যার উপরে তার নির্ভর সেটা বাদ দিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিৎ নয়।

এখানে অবশ্য আরেকটা সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো এসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন প্রবীণ নেতা, বয়স, অভিজ্ঞতা বা ইসলামের জন্য অবদানের কারণে সকল মুজাহিদদের

মাঝে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হওয়া ইত্যদি কারণে। এক কথায় আমীর হিসেবে নয় বরং মুরব্বী হিসেবে দুদল মুজাহিদদের মাঝে মিমাংসা করার জন্য তিনি এসব সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন। যেহেতু এসব দিক থেকে তার অবস্থান সবার নিকট জানা তাই এটা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরী মনে করেন নি।

দাওলাতুল ইসলাম কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলোকে এ অর্থেই গ্রহণ করেছে তাই তারা এসব সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা তুলে ধরেছে কিন্তু আয়মান আজ-জাওয়াহেরী কোন যোগ্যতায় এসব সিদ্ধান্ত শুনিয়েছেন সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেনি। যেহেতু মুরব্বী হিসেবে দু-দল মুজাহিদদের মধ্যে মিমাংসার স্বার্থে তিনি যে কিছু আদেশ-নিষেধ বা পরামর্শ দিতে পারেন সে ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ তিনি সকলের মুরব্বী এবং প্রবীণ জিহাদী নেতা।

দাওলাতে ইসলাম যে, আজ-জাওয়াহেরীর সিদ্ধান্তকে আমীরের নির্দেশ নয় বরং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মিমাংসা হিসেবে গণ্য করেছে তার প্রমাণ আজ-জাওয়াহেরীর বক্তব্যের পরপরই তার উত্তরে প্রকাশিত আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানীর উপরোক্ত বক্তব্য যেখানে তিনি বলেন, "একজন বিচারকের পক্ষে উভয়পক্ষের সাথে সাক্ষাত না করে এবং কাদের সাক্ষী অনুযায়ী বিচার পরিচালিত হচ্ছে তা প্রকাশ না করেই রায় ঘোষণা করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?"

এই বক্তব্যের অর্থ সম্পর্কে এ ধরণের সংশয় যে সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ-জাওয়াহেরী নিজেই স্বীকার করেছেন।

এসব ঘটনার অনেক পরে ২ মে ২০১৪ সালে "শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরক্ষার জন্য একটি সাক্ষ্য" শিরনামে তিনি একটি বক্তব্যে দেন। সেখানে তিনি এই রায়টি আমীরের নির্দেশ নাকি বিচারকের মিমাংসা এধরণের একটি প্রশ্ন তুলে ধরে তার উত্তরে বলেন, আমি ২৮ শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরীতে (৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং) দাওলাতুল ইসলামের ভাইদের একটা দীর্ঘ পত্র মারফত এটা জানিয়ে দিয়েছি যে, এটা আমীরের নির্দেশ বিচারকের মিমাংসা নয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ২০ জুন ২০১৩ তারিখে আদনানীর বক্তব্যে বিষয়টিকে বিচারকের রায় মনে করার আড়াই মাস পর জাওয়াহেরীর পক্ষ থেকে সঠিক ব্যাখ্যা তাদের ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়। তাও করা হয় গোপনে। আর প্রকাশ্যে বিষয়টি ঘোষণা করা হয় ২ মে ২০১৪ অর্থাৎ প্রায় এক বছর পর। বিষয়টা অনেকটা

গন্ডারের চামড়ার মতো। কথায় বলে, গন্ডারের চামড়ায় বিলি কাটলে বারো বছর পর হাসে। ইরাক ও শামে মুজাহিদদের মধ্যে যেসব গন্ডগোল হচ্ছে সেগুলো মিমাংসার জন্য ঘটনার দুই-তিন মাস এমন কি এক বছর পর সিদ্ধান্ত বর্ণনা করলে ক্ষয়-ক্ষতি যা হবার তা তো আগেই হয়ে যাবে আর যখন সিদ্ধান্ত এসে পৌছাবে তখন স্থানীয় নেতৃত্বদের পক্ষে সে সিদ্ধান্ত বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। যেহেতু ততদিনে প্রেক্ষাপট অনেক পাল্টে যাবে। ফলে পুরোনো সিদ্ধান্তের বদলে নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন দেখা দেবে। কিন্তু এই নতুন সিদ্ধান্ত আসতে আরও দু-তিন মাস লেগে যাবে। ততদিনে অবস্থা আবারও পাল্টে যাবে। এভাবে কি কারও আনুগত্য করা যায়? সম্ভবত একারণেই বিশ্বের যেখানেই আল-কায়েদার নেতৃত্ব আছে সেখানকার স্থানীয় নেতারা প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে উপরের নির্দেশ আসার অপেক্ষা করে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও তাদের এসব সিদ্ধান্ত বাতিল করে না। এভাবে স্থানীয় নেতৃত্বের উপর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাব দূর্বল হয়ে পড়ে। তারা সবাই আল-কায়েদাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কিন্তু প্রকৃত অর্থে কেউ এর আনুগত্য করে না বা আনুগত্য করতে পারে না।

যাই হোক আনুগত্য করা যায় কিনা সেটা আমাদের বিষয় নয় আমাদের বিষয় হলো, দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার আনুগত্যের অধীন ছিল কিনা।

দাওলাতুল ইসলামের সাথে জাবহাতুন নুসরার বিরোধ এবং আজ-জাওয়াহেরীর এই মিমাংসা আর দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে তা মানতে অস্বীকার করা এসব ঘটনার এক বছর পর ২ মে ২০১৪ তারিখে আজ-জাওয়াহেরীর একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন দাওলাতুল ইসলাম তার হাতে বায়াত। বিভিন্ন পুরোনো নথিপত্র ঘেটে এবং অনেক চিঠি-পত্র থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এখন আমরা সেই চিঠিটির উল্লেখযোগ্য অংশ উল্লেখ করবো এবং তার মাধ্যমে বায়াতের বিষয়টি প্রমাণিত হয় কিনা সেটা ভেবে দেখবো।

উক্ত বক্তব্যে বহু সংখ্যক গোপন নথিপত্র প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয়দের সাথে দাওলাতের ইসলামের নেতৃস্থানীয়রা গোপনে যেসব পত্র বিনিময় করেছেন সেগুলো সেখানে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। সেসব পত্রে দাওলাতুল ইসলামের নেতারা আল-কায়েদার নেতাদের আমীর, শায়েখ, জনাব ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে সম্মোধন করেছেন। কোনো কোনো পত্রে বায়াত বা আনুগত্যের কথাও

উল্লেখ আছে।

এখানে প্রথম যে প্রশ্নটা সৃষ্টি হয় তা হলো, এসব পত্র যে সত্যি সত্যিই দাওলাতে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রেরিত তার প্রমাণ কি? সত্য কথা হলো এ বিষয়ে তিনি কোনো বাস্তব প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। কেবল মুখের দাবী ছাড়া। কিন্তু যেখানে দাওলাতে ইসলাম সরাসরি বায়াতের বিষয়টি অস্বীকার করছে সেখানে একতরফাভাবে কিছু গোপণ পত্র সামনে এনে বায়তের বিষয়টি সাবেত করা কিভাবে সম্ভব? বুদ্ধিমান যে কেউ প্রশ্ন করবে, এসব পত্র যে সত্যি তার প্রমাণ কি? যখন দুজনের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বিমত হয় তখন কারো একার দাবীতে তো কোনো বিষয় সত্য প্রমাণিত হতে পারে না।

সম্ভবত আয়মান আজ-জাওয়াহেরীও বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন তাই কিছু কিছু পত্র প্রমাণসহ পেশ করেছেন। আমরা তার পত্রগুলোও দেখবো সেগুলোর পক্ষে যে প্রমাণ দিয়েছেন সেটিও দেখবো।

প্রথমেই তিনি বলেন,

لما قامت دولةُ العراقِ الإسلاميةِ دون أن تُستأمَرَ فيها قيادةُ جماعةِ قاعدةِ الجهادِ، وعلى رأسِها الإمامُ المجددُ الشيخُ أسامةُ بنُ لادنٍ رحمه اللهُ، بل ولم تستشرْ، ولا حتى أُخطرتْ بها

ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয়দের এমনকি শায়েখ উসামা বিন লাদিনের নির্দেশ ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে তার পরামর্শ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি তাকে অবগতও করা হয় নি।

এরপর তিনি বলেন, তখন দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে আবু হামযা আল-মুহাজির (রহঃ) লিখে পাঠান আসলে দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার নিকট বায়াতবদ্ধ এবং এর আমীর আবু উমর আল বাগদাদী (দাওলাতে ইসলামের প্রথম আমীর) এর আমীর হলেন শায়েখ উসামা বিন লাদিন।

এরপর তিনি বলেন,

كان الإخوةُ في القيادةِ العامةِ لجماعةِ قاعدةِ الجهادِ، وفي دولةِ العراقِ الإسلاميةِ يتعاملون على أساسِ هذه القاعدةِ؛ أن دولةَ العراقِ الإسلاميةِ جزءٌ من جماعةِ قاعدةِ الجهادِ، ومن الأمثلةِ على ذلك

আল-কায়েদার ও দাওলাতুল ইসলামের নেতৃস্থানীয়রা এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করতেন যে দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার একটি

অংশ। এর কিছু উদাহরণ হলো,

এরপর তিনি দলীল প্রমাণ সহ কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমেই তিনি বলেন,

الرسالةُ التي نشرها الأمريكانُ من الوثائقِ التي وجدوها في منزلِ الشيخِ أسامةَ بنِ لادنٍ -رحمه اللهُ- برقمِ : SOCOM-2012-0000011 Orig

শায়েখ উসামা বিন লাদিনের বাড়িতে (অ্যাবোটাবাদে) আমেরিকানরা যে ডকোমেন্টারী পেয়েছিল তাতে তারা যে চিঠিটি ছাপিয়েছে যার নং- SOCOM-2012-0000011 Orig যাতে এসেছে শায়েখ আতীয়্যা শায়েখ আবু হামযা আল মুজাহির এবং শায়েখ আবু উমর আল-বাগদাদী আর তার লোকদের চিঠি লিখে দিক নির্দেশনা দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন যাতে তারা ভুল ত্রুটির শিকার না হয়।

এভাবে তিনি তার বক্তব্যে আমেরিকানদের প্রকাশিত নথিপত্র থেকে নং সহ আরও কয়েকটি চিঠি পত্র পেশ করেছেন।

একপর্যায়ে উল্লেখ করেন,

لما تولى الشيخُ أبو بكرٍ الحسينيُ البغداديُ -وفقه اللهُ- الإمارةَ دونَ إذنِ القيادةِ العامةِ أرسل الشيخُ عطيةُ -رحمه اللهُ- رسالةً للقيادةِ في دولةِ العراقِ الإسلاميةِ

যখন শায়েখ আবু বকর আল-হুসাইনী আল-বাগদাদী আল্লাহ তাকে তাওফিক দিন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়াই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন শায়েখ আতীয়্যা দাওলাতুল ইসলামের নেতৃত্বস্থানীয়দের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন।

এরপর তিনি উক্ত চিঠির বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন যাতে তাদের পরামর্শ নিয়ে নেতা নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েকজন ব্যক্তির নাম পাঠাতে বলা হয়েছিল যাতে আল-কায়েদার নেতৃত্বস্থানীরা তাদের মধ্যে একজনকে বাছাই করতে পারে।

এরপর তিনি আমেরিকানদের প্রকাশিত অ্যাবোটাবাদের ডকোমেন্টারী হতে আরও একটা দলীল পেশ করেন যার নং- SOCOM-2012-0000019 Orig

তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, এসব চিঠির উত্তরে দাওলাতে ইসলামের পক্ষ থেকে বলা হয়, বেশি দেরি করা সম্ভব নয় বিধায় আমরা নিজরা আমীর নিয়োগ করেছি। এখন যদি আপনার ভিন্ন কোনো আমীর নিয়োগ করেন তবে আমরা তার আনুগত্য

করবো।

এরপর তিনি বলেন, উসামা বিন লাদিন শহিদ হওয়ার পর দাওলাতে ইসলামের তৎকালীন আমীর আবু বকর আল-বাগদাদী প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়ে আল-কায়েদার সদস্য ও আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর উদ্দেশ্য বলেন,

وسيروا على بركةِ اللهِ فيما ترونه من أمرِكم، وأبْشروا؛ فإنّ لكم في دولةِ العراقِ الإسلاميّةِ رجالًا أوفياءَ ماضُون على الحقِّ في دربِهم لا يَقيلونَ ولا يَستَقيلون

আপনারা যেভাবে চান কাজ করতে থাকুন। ইরাকের দাওলাতে ইসলামে আপনাদের বিশ্বস্ত লোক রয়েছে। যারা হকর উপর টিকে রয়েছে কখনও তা থেকে বিরত হবে না অব্যাহতিও প্রার্থনা করবে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই কথাটিকে জাওয়াহেরী বায়াতের পক্ষে পৃথক দলীল হিসেবে গণ্য করেছেন। নেতার মৃত্যুতে ভাইদের শন্তনা দেওয়া সময় তুমি কোনো চিন্তা করবে না আমরা তোমার সাথে আছি বা তোমার যা ইচ্ছা হয় আমাকে বলবে আমি তোমার বিশ্বস্ত লোক এভাবে বললে কি সেটা বায়াত হওয়া বোঝায়?

এটাই হলো একমাত্র প্রকাশ্য বক্তব্য যা আজ-জাওয়াহেরী তার বক্তব্যে দাওলাতে ইসলামের বায়াত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে বায়াতের কোনো নাম গন্ধ পাওয়া যায় না।

তবে এরপরই আবার একটা গোপন পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে স্পষ্টভাবে বায়াতের কথা বলা হয়েছে। তাতে এসেছে দাওলাতে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি চিঠিতে বলা হয়,

، وهو يسألُ عن المناسبِ من وجهةِ نظرِكم عند إعلانِ الأميرِ الجديدِ للتنظيمِ عندكم، هل تُجدّدُ الدّولةُ بيعتَه علَنًا أم تكون سرًّا كما هو معلومٌ معمولٌ به سابقًا؟

তিনি প্রশ্ন করেছেন, আপনাদের মত কি? আপনাদের নতুন আমীর নিয়োগের সময় দাওলাত কি প্রকাশ্যে তার বায়াতের কথা ঘোষণা করবে না কি সেটা গোপনে থাকবে যেমনি পূর্ব থেকে চলে আসছে?

এর পর তিনি বলেন,

كان الشيخُ أبو بكرٍ البغداديُ الحسينيُ يخاطبني بصفتي أميرَه، حتى آخرِ رسالةٍ لي منه –حفظه الله–

শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদী আল-হুসাইনী আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন আমার

নিকট চিঠি লিখলে আমাকে আমীর বলে সম্মোধন করতেন। এমনকি আমার নিকট লেখা তার শেষ চিঠিতে এমনই করেছেন।

এরপর তিনি আবু বকর আল-বাগদাদীর চিঠিটি উল্লেখ করেন যার শুরুতেই বলা হয়েছে,

فإلى أميرِنا الشيخِ المفضالِ

আমাদের আমীর সম্মানিত শায়েখের প্রতি ....

এরপর আল-জুলানীর কর্মকান্ড সম্পর্কে তাকে অবহিত করে খুরাসানের মাশায়েখ দের তার বিপক্ষে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেছেন এবং হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন,

ونرى أن أيَ تأييدٍ لما قام به هذا الخائنُ ولو تلميحًا سيفضي لفتنةٍ عظيمةٍ،

আমরা মনে করি এই খেয়ানতকারী (আল-জুলানী) যা করেছে তাকে আকারে ইঙ্গিতেও সমর্থন করলে বড় ধরণের ফিতনা সৃষ্টি হবে।

এরপর আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানীর একটি বক্তব্য পেশ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে,

كتبها العبد الفقير أبو محمد العدناني ..... معذرةً إلى اللهِ تعالى، ثم إلى الأمةِ، ثم إلى أمرائه الشيخِ الدكتورِ أيمنَ الظواهريِ، ثم الى الشيخِ الدكتورِ أبي بكرٍ البغداديِ حفظهم اللهُ

এটা অধম বান্দা আবু মুহাম্মাদ আল আদনানী লিখছে ... সে আল্লাহর নিকট এই উম্মতের নিকট এবং তার আমীর আইমান আজ-জাওয়াহেরী ও আবু বকর আল-বাগদাদীর নিকট ওজর পেশ করছে ....

আজ-জাওয়াহেরীর ভাষ্য মতে তার ফয়সালা অমান্য করার পর আবু বকর আল বাগদাদী আল-কায়েদার কোনো একজন নেতাকে একটি পত্র লিখে পাঠান, সেখানে তিনি বলেন, ঐ ফয়সালাটির উপর তিনটি স্তরে গবেষণা করা হয়েছে।

ক. দাওলাতে ইসলামের শামে অবস্থিত নেতাদের সাথে পরামর্শ করা।

খ. দাওলাতে ইসলামের ইরাকে অবস্থিত নেতাদের সাথে পরামর্শ করা।

গ. দাওলাতে ইসলামের শারয়ী বোর্ডের নিকট মতামত নেওয়া।

এরপর তিনি বলেন,

فما قررنا البقاءَ إلا بعد أن تبين لنا أن طاعتَنا لأميرِنا معصيةٌ لربِنا ومهلكةٌ لمن معنا من المجاهدين وخاصّةً المهاجرين، فاطعنا ربَنا وآثرنا رضاه على رضا الأميرِ، ....، ولا يقال عمّن عصى أمرًا لأميرٍ يرى فيه مهلكةً للمجاهدين ومعصيةً للهِ تعالى أنه أساءَ الأدبَ

আমরা শামে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেবল তখন নিয়েছি যখন বুঝতে পেরেছি আমাদের আমীরের নির্দেশ মান্য করলে আল্লাহর অবাধ্য হতে হবে। এবং আমাদের সাথে যেসব মুজাহিদ আছে বিশেষভাবে মুহাজিরদের জন্য এটা ধ্বংস ডেকে আনবে। তাই আমরা আল্লাহর আনুগত্য করেছি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে আমীরের সন্তুষ্টি অর্জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। যে আমিরের নির্দেশের মধ্যে মুজাহিদদের ধ্বংস দেখতে পায় এবং আল্লাহর অবাধ্যতা দেখতে পায় এমন বলা যায় না যে সে বেয়াদবী করেছে।

এরপর আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

وأكتفي بهذه الأمثلة

এসব উদাহরণ পেশ করাটাই আমি যথেষ্ট মনে করছি।

এরপর তিনি বলেন পূর্বের সিদ্ধান্তটি বিচার আকারে ছিলনা বরং আমীরের নির্দেশ আকারে ছিল।

এরপর ইরাকে দাওলাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমর্থন করলেও শামে কেনো সমর্থন করছেন না সে বিষয়ে বলেন,

যেহেতু শামে দাওলাতের ঘোষণা দিয়ে মুজাহিদরা বিভক্ত হয় পড়েছে এবং এ কারণে শামে প্রকাশ্যে আল-কায়েদার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল কায়েদার নির্দেশ ছিল শামে প্রকাশ্যে আল-কায়েদার উপস্থিতির ঘোষণা না করা। এমন কি এ স্তরে কোনো ইমারত ঘোষণা না করাটাই আল-কায়েদার নির্দেশ ছিল।

এর প্রমাণ স্বরুপ তিনি আবারও আমেরেকিনদের প্রকাশিত অ্যাবোটাবদের নথিপত্র থেকে দলিল দেন এবং কষ্ট করে তার নাম্বারটিও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

وهي الرسالةُ التي نشرها الأمريكانُ برقمِ: SOCOM-2012-0000019 Orig

এই চিঠিটি আমেরিকানরা প্রকাশ করেছে তার নং- SOCOM-2012-0000019 Orig

এরপর তিনি আবু বকর আল-বাগদাদীকে তার দাদা হাসান رضي الله عنه এর দোহায় দিয়ে ইরাকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যেভাবে তার দাদা হাসান رضي الله عنه নিজের

খেলাফত পরিত্যাগ করে মুয়াবিয়া ﷺ এর সাথে মিমাংসা করেছিলেন সেভাবে শামে দখলকৃত এলাকা অরক্ষিত ফেলে রেখে আবু বকর আল-বাগদাদীকেও তিনি ইরাকে ফিরে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করেন।

এই বক্তব্যটির মাধ্যমে আজ-জাওয়াহেরী প্রমাণ করতে চেয়েছেন দাওলাতুল ইসলাম গোড়া থেকেই আল-কায়েদার নিকট বায়াত। দাওলাতুল ইসলামের সাবেক আমীর আবু উমর আল-বাগদাদী এবং তার পরবর্তী আমীর আবু বকর আল-বাগদাদী উভয়েই আল-কায়েদার নিকট বায়াতবদ্ধ। কিন্তু তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে কি এটা প্রমাণিত হয়?

প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি যেসব নথি-পত্র উল্লেখ করেছেন তার সবই গোপন সূত্র থেকে বর্ণিত। এগুলোর স্বপক্ষে মুখের দাবী ছাড়া অন্য কোনো দলীল-প্রমাণ বা অন্য কারো সাক্ষ্য তিনি উল্লেখ করতে পারেন নি। তবে মাঝে মধ্যে আমেরিকনদের প্রকাশিত অ্যাবোটাবাদের নথিপত্র থেকে নিজের কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বেশ কষ্ট করে ইংরেজী হরফ আর সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করেছেন। তার এ কান্ড দেখে না হেসে পারা যায় না। তিনি স্বয়ং আল-কায়েদার আমীর, কথা বলছেন তার সংগঠনের একান্ত গোপন বিষয় নিয়ে আর এ বিষয়ে দলীল দিচ্ছেন জাত শত্রু আমেরিকার প্রকাশিত নথি-পত্রের ফাইল থেকে। এসব নথি-পত্র প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তার সত্যতা নিয়ে সচেতন মহল সন্দিহান রয়েছেন। এ সন্দেহর সঙ্গত কারণও রয়েছে। যেহেতু এটা প্রকাশ করেছে আমেরিকা আর আল কায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদদের প্রধান শত্রুই হলো আমেরিকা। এসব নথিপত্রের মধ্যে যে তারা এমন কিছু ঢুকিয়ে দেবে না যা মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবে তার কি নিশ্চয়তা আছে! আল কায়েদার আমীর নিজেই তার সংগঠনের গোপন বিষয়ে আমেরিকার নথিপত্রের উপর নির্ভর করছেন এর মাথ্যমে তথ্যের জগতে আমেরিকার গ্রহণযোগ্যতা কি বহু গুণে বুদ্ধি পায় না? এমন হতে পারে যে, কথাগুলো আসলে সত্য কিন্তু তারপরও আমেরিকার প্রকাশিত নথি হতে দলীল দেওয়াটা সঠিক নয় যেহেতু এর মাধ্যমে আমেরিকার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করা হয় অথচ তারা বিশ্বাসঘাতক। এভাবে নিজের ঘরের গোপন বিষয়ে পরের লোককে স্বাক্ষি বানানোটা অনেকটা ঐ ব্যক্তির কাহিনীর মতো হয় যার স্ত্রী দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। দেওয়ালের নিচে তার মাথাটা এমনভাবে পিষ্ট হয়েছিল যে, মুখ দেখে আর চেনার উপায় ছিল না। এরপর যখন পুলিশ এসে তাকে প্রশ্ন করলো,

— এ যে তোমার স্ত্রী তার প্রমাণ কি?

লোকটি বলল,

— আমার স্ত্রীর তলপেটে একটা তিল আছে বিশ্বাস না হলে এই লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

মোট কথা আমেরিকা অ্যাবোটাবাদ থেকে চুরি করে যেসব নথি-পত্র প্রকাশ করেছে তা কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয় নয়। অতএব, গোল্ডাখানেক ইংরেজী হরফ কষ্ট করে উচ্চারণ করে দলীল পেশ করা নিরর্থক।

এখন বাকী থাকে আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর নিজের দাবী যার পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ পেশ করেন নি। আজ-জাওয়াহেরীর একার দাবীতে বিষয়টি অবশ্যই প্রমাণিত হবে না। অতএব এ বিষয়ে দাওলাতে ইসলামের বক্তব্য কি সেটা আমাদের শুনতে হবে।

আজ-জাওয়াহেরীর উপরোক্ত বক্তব্যের এক সপ্তাহ পরে ১১ মে ২০১৪ ইং তারিখে আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী " দুঃক্ষিত হে আল-কায়েদার আমীর" শিরোনামে একটি বক্তব্য প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি আজ-জাওয়াহেরীর কথার উত্তর প্রদান করেন।

সেখানে তিনি আজ-জাওয়াহেরীর উদ্দেশ্যে বলেন,

إنّك في شهادتك الأخيرة لبّستَ على الناس، وأوهمتَهُم أمراً أجهدْتَ نفسكَ لإثباتِهِ ولَم تُثبته، ولَن تُثبتَه، إذْ تعسَّفتَ في إخراج مقاطع من رسائل سرّية على الإعلام لتحمّلنا جُرماً أنتَ اقترفتَهُ وتولّيتَ كِبرَه

আপনি আপনার শেষ বক্তব্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাদেরকে আপনি একটা বিষয়ে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আর অনেক কষ্ট করে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রমাণ করতে সক্ষম হন নি এবং কখনও সক্ষম হবেনও না। আপনি অনেক গোপন চিঠিপত্র মিডিয়ায় প্রকাশ করে আমাদের ঘাড়ে এমন একটা বোঝা (বায়াত ভঙ্গের বোঝা) চাপাতে চেয়েছেন যাতে আসলে আপনি (আল-জুললানীর বায়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে) লিপ্ত হয়েছেন এবং তাতে আপনি প্রধান ভূমিকা রেখেছেন।

এরপর তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন,

الدولةُ ليست فرعاً تابعاً للقاعدة، ولم تكن يوماً كذلك، بل لو قدّر اللهُ لكم أن تطؤوا أرض الدولة الإسلامية، لَما وسعكم إلاّ أن تبايعوها وتكونوا جنوداً لأميرها القرشيّ حفيد الحسين، كما أنتم اليوم جنودٌ تحت سلطان الملاّ عمر،

فلا يصحّ لإمارةٍ أو دولةٍ أن تُبايع تنظيماً

দাওলাত কখনও আল-কায়েদার হাতে বায়াত নয়। কোনো দিন এমন ছিলও না। বরং যদি আল্লাহ আপনাকে দাওলাতুল ইসলামের ভূমিতে নিয়ে আসে তবে দাওলাতুল ইসলামের হাতে বায়াত হওয়া ছাড়া এবং দাওলাতুল ইসলামের কোরেশী হুসাইনী আমীরের অধীনস্ত সৈনিক হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। যেভাবে এখন আপনারা মোল্লাহ ওমরের অধীনে সৈনিক হয়ে আছেন। যেহেতু কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সংগঠনের হাতে বায়াত হওয়া সম্ভব নয়।

এরপর তিনি বলেন,

إنّ كل ما ذكرتَ من شهادتك صحيح، بل وأزيدُكَ عليه أننا كنّا ولحينٍ قريب نُجيبُ مَن يسألنا عن علاقة الدولة بالقاعدة بأنّ علاقتها علاقة الجنديّ بأميره،

আপনি যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন সেগুলো সবই সঠিক বরং আমি আপনাকে আরও কিছু সাক্ষ্য শোনাচ্ছি। যখন কেউ আমাদের বলতো দাওলাতের সাথে আল-কায়েদার সম্পর্ক কিরুপ? আমরা বলতাম, আল-কায়েদার সাথে দাওলাতের সম্পর্ক নেতার সাথে সৈনিকের ন্যায়।

এরপর তিনি বলেন,

فإنّما هي تنازلٌ وتواضعٌ وتشريفٌ وتكريمٌ لكُم مِنّا، وعندنا من الوقائع والأحداث والشهادات المشابهة لشهادتك الأضعاف تُثبت طبيعة هذه العلاقة

এটা আসলে আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি বিনয় প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে করা হতো।

অর্থাৎ আল-আদনানী আজ-জাওয়াহেরী উল্লেখিত চিঠি-পত্রের সত্যতা স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন, সেখানে আমীর, শায়েখ, বায়াত, আনুগত্য ইত্যাদি যা কিছু শব্দ আছে তা প্রকৃত অর্থে বায়াত বোঝাতে নয় বরং আল-কায়েদার নেতাদের প্রতি সম্মান ও দাওলাতুল ইসলামের নেতাদের পক্ষ থেকে বিনয় হিসেবে বলা হতো।

এরপর তিনি বলেন,

وعندنا من الوقائع والأحداث والشهادات المشابهة لشهادتك الأضعاف تُثبت طبيعة هذه العلاقة

আমাদের নিকট এমন অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ ও ঘটনা রয়েছে যার মধ্যমে বিষয়টির সঠিক অর্থ কি তা প্রমাণিত হয়।

এরপর তিনি বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করতে থাকেন। তিনি বলেন,

قُل لي بربّك: ماذا قدّمتَ للدولة إن كُنتَ أميرَها؟ بماذا أمدَدّتها؟ عَن ماذا حاسبتَها؟ بِمَ أمرتَها وعمَّ نهيتَها؟ مَن عزلْتَ ومَن وَلّيتَ فيها؟ لم يحدث شيءٌ من هذا أبداً.

আপনি যদি দাওলাতের আমীর হয়ে থাকেন তবে বলুন দাওলাতের জন্য আপনি কি অবদান রেখেছেন? দাওলাতকে আপনি কি দিয়ে সহায়তা করেছেন? দাওলাতের কোনো কাজের কখনও হিসাব নিয়েছেন কি? দাওলাতকে আপনি কখন কি নির্দেশ দিয়েছেন এবং কখন কি বিষয়ে নিষেধ করেছেন? কোন পদে কাকে নিয়োগ করেছেন আর কাকে পদচ্যুত করেছেন?

আদনানীর কথার অর্থ হলো, যদি সম্মান প্রকাশের অর্থ ছাড়াই প্রকৃত অর্থেই আপনি দাওলাতের আমীর হয়ে থাকেন তবে প্রকৃত আমীরের কোনো কাজ আপনি কি দাওলাতের ব্যাপারে করেছেন?

এরপর আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

بينما عندنا الإثباتات خلاف ذلك من أفواه قادة الدولة والقاعدة، وأنتَ على رأسهم، فمن فِيكَ سمع العالم أنّ التنظيم حُلّ في العراق وبايعَ الدولة وانخرطَ فيها

আপনি যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলাম এবং আপনি সহ আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয়দের মুখের বক্তব্য রয়েছে। আপনার মুখ থেকেই তো বিশ্বের মানুষ শুনেছে যে ইরাকের আল-কায়েদা দাওলাতের সাথে মিশে গেছে এবং তাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

আদনানীর এই কথাটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আজ-জাওয়াহেরী তার বক্তব্যে যেসব ব্যক্তিদের চিঠি-পত্রের কথা উল্লেখ করে আল-কায়েদার নিকট দাওলাতে ইসলামের বায়াত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তারা যদি বলে থাকেন আসলে দাওলাত আল-কায়েদার নিকট বায়াত নয় তাহলে তো আজ-জাওয়াহেরী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবেন। এতদূর হলেও না হয় হতো। কিন্তু আদনানী তো বলেছেন এমনকি আজ-জাওয়াহেরী নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে, ইরাকে আল-কায়েদা দাওলাতের সাথে মিশে গেছে এবং দাওলাত আল-কায়েদার নিকট বায়াত নয়? যদি এমন প্রমাণিত হয় তবে তো আদনানীর কথা সঠিক প্রমাণিত হবে আর জাওয়াহেরীর কথা মিথ্যা ও স্ববিরোধ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আজ-জাওয়াহেরী যে একথা বলেছেন তার প্রমাণ কি?

সাহাব মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর লিকায়ে মাফতুহ (খোলা আলোচনা) শিরনামে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। সেখানে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র আর আফগানিস্তানের তালেবানদের ইসলামী ইমারত একজন আমীরের অধীনে কিনা আর মোল্লা উমর, শায়েখ আবু উমর আল-বাগদাদী (তৎকালীন সময়ে ইরাকের দাওলাতে ইসলামের আমীর) এবং শায়েখ উসামা বিন লাদিন এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি? অর্থাৎ তারা কেউ কারও আমীর কিনা? এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,

دولة العراق الإسلامية وإمارة أفغانستان الإسلامية -وأضف إليهما- الإمارة الإسلامية في القوقاز إماراتٌ إسلاميةٌ لا تتبع لحاكمٍ واحدٍ، وعسى أن تقوم قريباً دولة الخلافة التي تجمعهم وسائر المسلمين. والشيخ أسامة بن لادنٍ -حفظه الله- جنديٌ من جنود أمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه الله، وجميع من ذكرت يتناصرون ويتعاونون على نصرة الإسلام والجهاد

ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম এবং আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারত তাদের সাথে আমি কোকাজের ইসলামী ইমারতকে যোগ করবো। এগুলো পৃথক পৃথক ইসলামী শাসন। তারা একজন নেতার অধীনে নয়। আমরা আসা করি দ্রুতই খেলাফতের রাজ্য কায়েম হবে যার অধীনে তারা সকলে একত্রিত হবে অন্যান্য মুসলিমরাও একত্রিত হবে। আর শায়েখ ওসামা বিন লাদিন আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমরের অধীনস্ত একজন সৈনিক।

আরেকটি প্রশ্ন ছিল এমন,

— ইরাকে আল-কায়েদা দাওলাতুল ইসলামের সাথে মিশে গেছে এটা কি সঠিক? ইরাকে আল-কায়েদা কেনো দাওলাতুল ইসলামকে বায়াত দিলো, দাওলাতুল ইসলাম কেনো আল-কায়েদাকে বায়াত দিল না?

এর উত্তরে আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

الدولة خطوةٌ في سبيل إقامة الخلافة أرقى من الجماعات المجاهدة، فالجماعات يجب أن تبايع الدولة وليس العكس، وأمير المؤمنين أبو عمر البغدادي -حفظه الله- من قادة المسلمين والمجاهدين في هذا العصر، نسأل الله لنا وله الاستقامة والنصر والتوفيق

দাওলাত হলো, খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে একটি পদক্ষেপ যা দল বা সংগঠন থেকে অনেক উর্ধ্বে। অতএব, সংগঠনের উপর আবশ্যক হলো দাওলাতের নিকট বায়াত

হওয়া সংগঠনের নিকট দাওলাত নয়। আর আমিরুল মু'মিনীন আবু উমর আল-বাগদাদী (দাওলাতের ইসলামের তৎকালীন আমীর) আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন এ যুগে মুসলিমদের ও মুজাহিদদের নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তি। আমরা আমাদের জন্য এবং তার জন্য সঠিক পথ, বিজয় ও তাওফিক প্রার্থনা করছি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আজ-জাওয়াহেরীর পূর্বের বক্তব্যের সাথে আদনানীরর বক্তব্যের হুবহু মিল রয়েছে। তারা দুজনেই বলেছেন, ইরাকের দাওলাতে ইসলাম আল-কায়েদার নিকটা বায়াত নয় যেহেতু দাওলাত কখনও সংগঠনের নিকট বায়াত হয় না। এটা প্রমাণ করে ইরাকের দাওলাতুল ইসলাম কখনও আল-কায়েদা বা মোল্লা উমরের নিকট বায়াত ছিল না।

কিন্তু এখন আজ-জাওয়াহেরী ভিন্ন দাবী করছেন। এর মাধ্যমে তার পূর্বের কথার সাথে পরের কথা সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে। হয়তো তিনি আগের কথাটি মিথ্যা বলেছেন অথবা এখন মিথ্যা বলছেন। বলাবাহুল্য যে এভাবে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে সত্যপন্থী কারও পক্ষে তার কোনো কথায় গ্রহণ করা উচিৎ নয়। তারপরও যদি কেউ আজ-জাওয়াহেরীর দুটি কথার মধ্যে কোনটি সত্য তা নির্ণয় করতে চান তাকে আমরা একটি মূলনীতি স্মরণ করিয়ে দেবো। সেটা হলো,

— জানা লোকের সামনে মিথ্যা বলা কঠিন কিন্তু অজানা লোকের সামনে মিথ্যা বলা সহজ।

এ বিষয়ে হাদিসে একটা সুন্দর কাহিনী বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন রোমের বাদশা যখন তৎকালীন কাফির নেতা আবু সুফিয়ানকে রসুলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন আরব দেশের অন্য একদল লোককে তার পাশে বসিয়ে রাখে আর বলে, এই ব্যক্তিকে আমি কিছু প্রশ্ন করবো যদি সে আমার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা ধরিয়ে দেবে। পরবর্তীতে আবু সুফিয়ান বলেন,

فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ

আল্লাহর কসম যদি সেদিন এমন ভয় না হতো যে, তারা আমার মিথ্যা ধরে ফেলবে তাহলে আমি রসুলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।

রোমের বাদশার এই বুদ্ধিটি বেশ চমৎকার। বর্তমানে যারা ইসলাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণার দাবী করে এ ধরণের কৌশল তাদের অনেকের মাথায় খেলে না। এখন যদি আমরা আজ-জাওয়াহেরীর উপর এই কৌশলটি প্রয়োগ করি তাহলে তার কথার

মধ্যে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা বের হয়ে আসবে।

আজ-জাওয়াহেরী যেসব গোপন চিঠি-পত্র উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রেরক ও প্রাপক হিসেবে তিনি আল-কায়েদার বেশ কিছু নেতার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, উসামা বিন লাদিন, শায়েখ আতীয়্যাতুল্লাহ লিব্বী এবং তিনি নিজে।

আজ-জাওয়াহেরী আগের কথাটি যখন বলেছেন তখন এসব চিঠি-পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ তথা শায়েখ উসামা বিন লাদিন, শায়েখ আতীয়্যাতুল্লাহ লিব্বী ও অন্যান্য নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা জীবিত ছিলেন। তাদের জীবদ্দশায় মিথ্যা বলা অধিক কঠিন ছিল। যেহেতু তারাও এসব চিঠির অর্থ সম্পর্কে জানেন। তাই মিথ্যা বললে হয়তো তারা ধরিয়ে দিতেন।

তাছাড়া এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় আজ-জাওয়াহেরী তখন যেসব কথা বলেছেন সেগুলো তাদের মতামত নিয়েই বলেছেন আর যদি নিজের ইচ্ছামত বলে থাকেন তবু কমপক্ষে আজ-জাওয়াহেরী বলার পরে তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু তাদের কর্ণগোচর হয়েছে এটা নিশ্চিত। আজ-জাওয়াহেরী এ কথাগুলো বলেছেন ২০০৮ সালে আর বিন লাদেন শহীদ হয়েছেন ২০১১ তে শায়েখ আতীয়্যা তার কয়েক মাস পরে। অর্থাৎ জাওয়াহেরীর কথাটি বলা এবং এসব নেতাদের শহীদ হওয়ার মাঝে প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে। এতদিনের মধ্যে তারা আজ-জাওয়াহেরীর উপরোক্ত কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি। এর অর্থ উক্ত কথাটি তাদের সবার নিকটি সঠিক হিসেবে গণ্য। সে হিসেবে উক্ত কথাটি কেবল আজ-জওয়াহেরী নয় বরং তাদের সবার মতামত হিসেবে গণ্য।

কিন্তু এখন ঐ সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে আজ-জাওয়াহেরী এসব চিঠিপত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মিথ্যা বলা তার জন্য সহজ। যেহেতু ধরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। অতএব, তার আগের কথাটিই সত্য আর পরের কথাটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এছাড়া আগের কথাটি যখন তিনি বলেছেন তখন দাওলাতুল ইসলামের সাথে আল-কায়েদার সুসম্পর্ক রয়েছে ফলে সত্য স্বীকারে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় নি কিন্তু পরের কথাটি যখন বলেছেন তখন উভয় পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারন করেছে আর বিরোধের সময় মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার প্রবণতা যে বৃদ্ধি পায় তা বলাই বাহুল্য। এখন যেহেতু তার দুটি কথা দুরকম অতএব সুসম্পর্কের সময় তিনি যে কথা বলেছেন সেটাই যে সত্য আর বিরোধের সময় যেটা বলেছেন সেটা মিথ্যা এ নিয়ে

কোনো সন্দেহ থাকে না।

অনেকে বলতে পারেন হয়তো আজ-জাওয়াহেরী প্রথম কথাটি যখন বলেছেন তখন দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার নিকট বায়াত ছিল না কিন্তু পরে বায়াত হয়েছে। এটা অবশ্য একটা জটিল যুক্তি হতো কিন্তু আজ-জাওয়াহেরী নিজেই এ পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। যেহেতু যে বক্তব্যে তিনি দাওলাতুল ইসলামের বায়াত দাবী করেছেন সেখানে দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আল-কায়েদার হাতে বায়াত এটাই দাবী করেছেন। তার কথা শুরুই হয়েছে আবু উমর আল-বাগদাদীর হাতে বায়াত হওয়ার মাধ্যমে দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরুতেই আবু হামযা আল মুহাজিরের চিঠির মাধ্যমে। যাতে বলা হয়েছে, শায়েখ উসামা বিন লাদিন শায়েখ আবু উমর আল-বাগদাদীর আমীর।

এরপর তিনি বলেন,

كان الإخوةُ في القيادةِ العامةِ لجماعةِ قاعدةِ الجهادِ، وفي دولةِ العراقِ الإسلاميةِ يتعاملون على أساسِ هذه القاعدةِ؛ أن دولةَ العراقِ الإسلاميةِ جزءٌ من جماعةِ قاعدةِ الجهادِ، ومن الأمثلةِ على ذلك

আল-কায়েদার ও দাওলাতুল ইসলামের নেতৃস্থানীয়রা এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করতেন যে দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার একটি অংশ।

এর পর তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন চিঠি-পত্র উল্লেখ করে দলীল দেওয়ার চেষ্টা করেন। মোট কথা দাওলাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আল-কায়েদার অধীনে ছিল এটাই তার দাবী। যা তার নিজের পূর্বের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। অতএব যে কোনো একটাকে মিথ্যা বলা ছাড়া উপায় নেই।

তাছাড়া এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। আজ-জাওয়াহেরী পূর্বের বক্তব্যে দাওলাতুল ইসলাম কেনো আল-কায়েদার হাতে বায়াত হয়নি সে প্রসঙ্গে বলেছেন,

— জামায়া (جماعة) তথা সংগঠনের উচিৎ দাওলা (دولة) তথা রাষ্ট্রের নিকট বায়াত হওয়া সংগঠনের নিকট দাওলা নয়।

এটা একটা মূলনীতি যা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আল-কায়েদা একটি সংগঠন হিসেবেই আছে কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নি আর দাওলা দাওলা হিসেবেই টিকে আছে। এমন কি যে বক্তব্যে আজ-জাওয়াহেরী আল-কায়েদার

নিকট দাওলার বায়াত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন সেখানেও তিনি নিজেই আল-কায়েদাকে বার বার জামায়া (جماعة) তথা সংগঠন এবং দাওলাকে বার বার দাওলা (دولة) তথা রাষ্ট্র হিসেবে সম্মোধন করেছেন। এমনকি তিনি শায়েখ আতীয়্যা থেকে একটি চিঠি উল্লেখ করেছেন যেখানে শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদীকে (أميرالمؤمنين في دولة العراق الاسلامية) ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে সম্মোধন করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র কখনও সংগঠনের নিকট বায়াত হয় না আজ-জাওয়াহেরী বর্ণিত এই মূলনীতির আলোকেই মাঝে কোনো সময় দাওলার জন্য আল-কায়েদার হাতে বায়াত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় নি।

আজ-জাওয়াহেরী সামান্য ভুল করে ফেলেছেন, দাওলাত আল-কায়েদার হাতে বায়াত এটা প্রমাণ করতে হলে তাকে আগেই দাওলাতুল ইসলাম যে দাওলাত তথা রাষ্ট্র এটা অস্বীকার করতে হতো। কিন্তু তখন তিনি এই চালাকি করতে ভুলে গেছেন।

এখন অবশ্য তিনি এ ভুল শুধরে নিয়েছেন। তিনি এখন আর দাওলাতকে দাওলাত তথা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করেননা। ইসলামী বসন্তের প্রথম পর্বে তিনি স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন। উক্ত বক্তব্যে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন,

رغم عدم اعترافي بشرعية دولتهم ناهيك عن خلافتهم

যদিও আমি তাদের দাওলাত তথা রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করি না তাদের খেলাফত তো দূরের কথা।

অথচ উপরের সকল বক্তব্যে আমরা দেখেছি তিনি দাওলাতে ইসলামকে দাওলাত তথা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করেছেন। এটা তার আরেকটি দ্বিমুখীতা। যদি তিনি দাওলাতকে স্বীকার করতেন আর কেবল খেলাফত অস্বীকার করতেন তবু হয়তো বলা যেতো শরীয়তের মানদন্ডে অগ্রহণযোগ্য মনে হওয়ার কারণে তিনি তা অস্বীকার করেছেন। সে ক্ষেত্রে তার মতামত ভুল না ঠিক সে বিষয়ে শরীয়তের দলীল-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করার সুযোগ ছিল। কিন্তু খেলাফতের সাথে সাথে দাওলাতকে রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে তার প্রকৃত চেহারা প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু এটা তার নিজের কথার সাথেই সাংঘর্ষিক। পূর্বে তিনি নিজেই দাওলাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শরীয়তের যেসব দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন তা এর বিপরীত। এতে প্রমাণিত হয় শরীয়তের দলীল-প্রমাণের আলোকে নয় বরং দাওলাতে ইসলামের

সাথে বিরোধিতা করার স্বার্থে তিনি এখন সত্য মিথ্যা যা খুশি বলে গোজামিল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য যে, এটা একটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কারো সাথে বিরোধ হলেই তার সব অস্বীকার করতে হবে এটা সঠিক নীতি নয়।

তার অনুসরণে এখন তার ভক্ত-সাগরেদরাও এখন দাওলাতকে রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। আল-জূলানী নিজেই এমনটি করেছেন। উপরে আমরা দেখেছি এমনকি আল-বাগদাদীর বায়াত ভঙ্গ করার সময়ও আল-জূলানী দাওলাতে ইসলামকে দাওলাত হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে অর্থাৎ দাওলাতুল ইসলাম আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর নির্দেশ অমান্য করার ছয় মাস পরও আল-জাজিরাকে দেওয়া তার প্রথম সাক্ষাতকারে আল-জুলানী দাওলাতুল ইসলাম বলেই সম্মোধন করেছেন। কিন্তু এখন আর তিনি দাওলাতুল ইসলামকে দাওলাত বলেন না বরং তার আগে জামায়া (جماعة) বা সংগঠন শব্দটি যোগ করে থাকেন। ২৭ মে এবং ১৩ জুন ২০১৫ ইং তারিখে আল-জাজিরাকে দেওয়া দুটি সাক্ষাতকারে তিনি বারবার দাওলাতকে জামায়াতে দাওলা (جماعة الدولة) তথা "দাওলা সংগঠন বা দাওলা দল" বলে সম্মোধন করেছেন।

অর্থাৎ আল-কায়েদার অনুসারীরা এখন হাস্যকরভাবে দাওলা তথা রাষ্ট্রের আগে সংগঠন বা দল শব্দটি যোগ করে দিয়ে জোর করে দাওলাকে সংগঠন প্রমাণের চেষ্টা করছেন। যাতে দাওলাতে ইসলাম যে আল-কায়েদার হাতে বায়াত এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়।

এসব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ বিষয়ে আদনানী যা বলেছেন সেটাই সত্য। অর্থাৎ দাওলাতের নেতৃস্থানীয়রা আল-কায়েদার নেতাদের সম্মান করতেন এবং আল-কায়েদার সাথে শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। এই সম্পর্ককে প্রকাশ করার জন্যই তারা আমীর, শায়েখ, আনুগত্য, বায়াত ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতেন এর মাধ্যমে তারাও প্রকৃত বায়াত বোঝাতেন না আর যাদের নিকট চিঠি পাঠানো হচ্ছে তারাও প্রকৃত বায়াত বুঝতেন না। যেহেতু এসব চিঠি পত্র গোপনে প্রেরণ করা হতো তাই এসব শব্দের কারণে সাধারন মুসলিমরা বিভ্রান্ত হবে এমন আশঙ্কাও ছিল না। যতদিন সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল ততদিন এভাবেই চলেছে কিন্তু যখন বিরোধ দেখা দিল তখন আজ-জাওয়াহেরী ঐ সকল চিঠি-পত্রের ভুল ব্যাখ্যা উত্থাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

অনেক অল্প জ্ঞানের ব্যক্তি বলতে পারে, আমীর, আনুগত্য, বায়াত ইত্যাদি শব্দ

ব্যবহার করার পরও কেবল সম্মান প্রকাশের জন্য এটা বলা হয়েছে প্রকৃত অর্থে বায়াত বোঝানোর জন্য নয় এটা কিভাবে সম্ভব? আসলে তারা ইসলামের ইতিহাস ও ভাষার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে অবগত নয়। ইসলামের ইতিহাসে আমীর, বায়াত ইত্যাদি শব্দ প্রকৃত অর্থে আনুগত্যের বায়াত ছাড়াও ভিন্ন অর্থে প্রয়োগের নজির রয়েছে।

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন,

كان عمر بن الخطاب إذا رأى أسامة بن زيد قال السلام عليك أيها الأمير فيقول أسامة غفر الله لك يا أمير المؤمنين تقول لي هذا قال فكان يقول له لا أزال أدعوك ما عشت الأمير مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنت علي أمير

উমর ইবনে খাত্তাব ﵁ যখনই উসামা ইবনে যায়েদকে ﵁ কে দেখতেন বলতেন, সালাম হে আমার আমীর। উসামা ﵁ বলতেন, হে আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন আপনি আমাকে একথা বলছেন? উমর ﵁ বলতেন, আমি আজীবন তোমার উদ্দেশ্যে এ কথায় বলতে থাকবো। রসুলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তুমি আমার উপর আমীর ছিলে। [তারিখে দামেশক]

ঘটনা হলো, মৃত্যুর আগে রসুলুল্লাহ্ ﷺ রোমের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণের ইচ্ছা করেন এবং তার আমীর করেন উসামা ইবনে যায়েদ ﵁ কে। উক্ত অভিযানে উসামা ﵁ এর অধীনে এমন কি আবু বকর এবং উমর ﵁ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে উমর ﵁ সারাটা জীবন উসামা ﵁ কে আমীর বলে সম্মোধন করেছেন। অথচ তিনি নিজে তখন খলীফা। এর মাধ্যমে না তিনি উসামার হাতে বায়াত হওয়া বুঝিয়েছেন আর না তার আনুগত্য করা ফরজ এটা বুঝেছেন। বরং এটা উমর ﵁ এর পক্ষ থেকে বিনয় প্রকাশ হিসেবে গণ্য।

খোদ আজ-জাওয়াহেরী লিকায়ে মাফতুহ তথা খোলা আলোচনা শিরোনামে প্রকাশিত বক্তব্যের দ্বিতীয় পর্বে দাওলাতুল ইসলামের প্রথম আমীর আবু উমর আলবাগদাদীকে আমীরুল মু'মিনুন বলে সম্মোধন করেছেন এর অর্থ কি এই যে, তিনি তখন শায়েখ আবু উমর আল-বাগদাদীর হাতে বায়াত ছিলেন? সত্য কথা হলো আনুষ্ঠানিক বায়াত ঘোষণা না করে কেবল, সম্মান বা সৌজন্যতার খাতিরে কাউকে আমীর বলে সম্মোধন করলেই সেটাকে বায়াতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না।

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন,

قال عكرمة بن أبي جهل يومئذ يعني يوم اليرموك من يبايع على الموت فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربع مائة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا

ইকরিমা বিন আবি জাহাল ইয়ারমুকের দিন বলেছিল কে আছে মৃত্যুর বায়াত নেবে? তখন তার হাতে হারিস ইবনে হিশাম, দিরার ইবনে আযওয়া এবং আরও চারশত জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বায়াত হোন এরপর তারা লড়াই করেন। [তা'রিখে দামেশক]

ইকরিমার এ বায়াত কিন্তু খেলাফত বা ইমারাতের বায়াত ছিল না বরং এটা ছিল যুদ্ধের ময়দানে প্রাণপনে লড়াই করার বায়াত। তিনি নিজে এবং তার হাতে যারা বায়াত হয়েছিল তারা সকলে এটা জানতেন। তা না হলে তারা কেউই তার হাতে বায়াত হতেন না আর তিনিও বায়াত হতে বলতেন না। যেহেতু একজন খলীফা বা আমীর থাকা অবস্থায় অন্য জনকে আমীর নিয়োগ করা বৈধ নয়।

এখন দাওলাতে ইসলামের নেতারা গোপন চিঠি-পত্রে আল-কায়েদার নেতাদের আমীর বলে সম্মোধন করেছেন বা তাদের নিকট বায়াত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু উভয় দলই এটা স্বীকার করছেন যে দাওলাত কখনও সংগঠনের নিকট বায়াত হয় না। সুতরাং এসব কথাকে প্রকৃত বায়াত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বরং সম্মান, সৌজন্যতা, বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মিথ্যা বায়াত দাবী করার আগ পর্যন্ত দাওলাতুল ইসলামের নেতারা আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছেন। এমন কি যখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে আল-জুলানীর পক্ষ নিয়ে বিচার করেছেন দাওলাতুল ইসলাম সে বিচার অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে আজ-জাওয়াহেরীর প্রতি সম্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আজ-জাওয়াহেরীর বিচারের পরই তার উত্তরে শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদী এবং তারপর আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী যে বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে আজ-জাওয়াহেরীর নামের পর হাফিজাহুল্লাহ বলে সম্মান প্রদার্শন করা হয়েছে। এছাড়া যে বক্তব্যে আয়মান আজ-জাওয়াহেরী দাওলাতের বায়াত প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেখানে আবু বকর আল-বাগদাদীর একটা পত্র তিনি পেশ করেছেন যাতে উক্ত বিচার অমান্য করার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রে তিনি আজ-জাওয়াহেরীকে আমীর বলে সম্মোধন করে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ শত বিরোধ সত্ত্বেও দাওলাতে ইসলামের পক্ষ থেকে আল-কায়েদার নেতাদের প্রতি সম্মান বাজায় রাখা হয়। কিন্তু যখন আজ-জাওয়াহেরী মিথ্যা বায়াত দাবী করেন তার জবাবে আল-আদনানী যে বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে আজ-জাওয়াহেরীর প্রতি

কিছুটা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এই মিথ্যা দাবীর পর হতে জাওয়াহেরীর প্রতি দাওলাতে ইসলামের পক্ষ থেকে সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে কঠোর মন্তব্যই করা হয়। অনেকে পূর্বের প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এসব বক্তব্য শুনে আপত্তি করে বলেন, এত বড় নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে কঠোর বক্তব্য কেনো দেওয়া হচ্ছে?

পাঠককে লক্ষ্য রাখতে হবে আজ-জাওয়াহেরী যখন সিদ্ধান্তগত ভুল করেছেন তখন দাওলাতে ইসলাম কেবল তার সিদ্ধান্তকে মানতে অস্বীকার করেছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। যেহেতু একটা মানুষের সিদ্ধান্তগত কিছু ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যখন তিনি সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা বলেছেন তখন তারা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এটা অবশ্যই সঠিক কর্মপন্থা। যত বড় নেতাই হোক সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা কথা বললে বা মিথ্যার পক্ষে অন্যায়ভাবে সমর্থন ব্যক্ত করলে তাকে অসম্মান করা অন্যায় হতে পারে না বরং তাকে সম্মান করাটাই অন্যায়। সুফীপন্থীরা তাদের পীর-বুযর্গদের ব্যাপারে এ ধরণের অন্যায় আচরণ করে থাকে। পাঠককে অনুরোধ করবো কেবল একটা বক্তব্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেবেন না বরং সম্পূর্ণ ঘটনাটা সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

মোট কথা, দাওলাতুল ইসলাম আল-কায়েদার নিকট বায়াতবদ্ধ ছিল না বরং একটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। আর জাবহাতুন নুসরার আমীর আল-জুলানী ছিল তার বিশ্বস্ত সৈনিক। তাকে তিনিই দায়িত্ব দিয়ে শামে জিহাদ করতে প্রেরণ করেন। এবং সম্পদ ও সৈন্য দিয়ে সহায়তা করেন। কিন্তু মিডিয়া দাওলাতুল ইসলাম সম্পর্কে অপবাদ রটাতো তাই সাধারন মানুষ দাওলাতকে খারাপ জানতো। আবু বকর আল-বাগদাদী চেয়েছিলেন প্রথমেই প্রকাশ্যে বিষয়টি ঘোষণা না করে নিজের সৈন্যদের অন্য নামে শামে পাঠাবেন। তারপর যখন শামের লোকেরা বুঝতে পারবে তারা আসলে মিডিয়াতে যেমন বলে তেমন নন বরং উত্তম মানুষ তখন ঘোষণা দেবেন যে আসলে এটারাই দাওলাতে ইসলামের সৈন্য। এভাবে তিনি দাওলাতুল ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এবং শামের মুসলিমদের রক্ষায় সীমানা পেরিয়ে ইরাক থেকে অভিযান প্রেরণ করেন।

কিন্তু যখন জাবহাতুন নুসরা শামে প্রভাব বিস্তার করে তখন আল-জূলানীর মনের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি তার আমীর আল-বাগাদাদীর সাথে মতপার্থক্যে

জড়িয়ে পড়েন। অবস্থা আরও জটিল হতে পারে এমন আশঙ্কা হলে আবু বকর আল-বাগদাদী প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দাওলাতে ইসললাম এবং জাবহাতুন নুসরাকে একতাবদ্ধ করার ঘোষণা দেন। আল-জূলানী সব ঘটনা স্বীকার করেন কিন্তু তার সাথে পরামর্শ করা হয়নি এই অজুহাতে আমীরের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। এর ফলে মুজাহিদদের দুটি দলের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা আল-জুলানীকে বায়াত ভঙ্গকারী প্রতারোক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের দর্শনে প্রভাবিত ব্যক্তিরা জাবহাতুন নুসরার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। যেহেতু আল-জূলানী তার আমীর আবু বকর আলবাগদাদীর বায়াত ভঙ্গ করে আল-কায়েদার আমীর আজ-জাওয়াহেরীর নিকট বায়াতের ঘোষণা দিয়েছিল তাই এই ঘটনার মিমাংসার দায়িত্ব স্বয়ংক্রীয়ভাবে আজ-জাওয়াহেরীর উপর বর্তায়। ইচ্ছা করলেই তিনি এ ঘটনার সহজ সমাধান করতে পারতেন। শরীয়তে আমীরের বায়াত ভঙ্গ করা অন্যায় অতএব আল-জূলানীকে তার পূর্বের আমীরের আনুগত্য করার নির্দেশ দিলে সেটা একদিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক রায় হতো অন্য দিকে জাবহাতুন নুসরার সাথে দাওলাতে ইসলামের যাবতীয় বিরোধ মিটে যেতো। কিন্তু তিনি আল-জূলানীর এই বায়াত গ্রহণ করে দুদল মুজাহিদের মধ্যে ফিতনার আগুণ উসকে দেন। তাছাড়া তিনি দাওলাতে ইসলামকে ইরাক থেকে ফিরে যেতে বলেন আর আল-জূলানীর উপর শামের দায়িত্ব অর্পণ করেন। দাওলাতে ইসলামের পক্ষ থেকে পূর্বেই আজ-জাওয়াহেরীকে সতর্ক করে বলা হয় আল-জূলানীর পক্ষ অবলম্বন করলে ব্যাপক ফিতনা হবে। কিন্তু তিনি সে দিকে কর্ণপাত করেননি। বরং বায়াত ভঙ্গকারী আল-জূলানীর পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। দাওলাতে ইসলাম শরীয়তের দৃষ্টিতে বেশ কিছু সমস্যা তুলে ধরে তার এ নির্দেশ অমান্য করে।

যেহেতু তিনি ইরাকের দাওলাতে ইসলামকে ইরাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। অথচ তখন শামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের দখলে ছিল। সেখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছিল। সেখানে হুদুদ কায়েম হতো। পূর্বে ঘোষিত ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সাথে সেসব ভূমিও ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য ছিল। কিন্তু জাবহাতুন নুসরা বা অন্যান্য জিহাদী সংগঠনরা তখনও কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় নি এখনও দেয় নি। কার্যকর ভাবে শামের কোথাও ইসলামী বিধান কায়েমও করে নি। অর্থাৎ এ সকল এলাকা ছেড়ে যদি সেদিন ইরাকের মুজাহিদরা ইরাকে ফিরে যেতো তবে তার কিছু অংশ হয়তো জাবহাতুন নুসরা দখল করতো আর বাকিটা তাগুত সরকার আর

তাগুতের মদদপুষ্ট সরকার বিরোধীরা দখল করে বদ দ্বীন কায়েম করতো। এছাড়া আরও অনেক বিষয় রয়েছে যার কারণে আজ-জাওয়াহেরীর উপরোক্ত নির্দেশটি বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। দাওলাতে ইসলাম মুরব্বী হিসেবে আজ-জাওয়াহেরীকে সম্মান করা সত্ত্বেও এসব কারণে তার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে।

এরপর শুরু হয় ভিন্ন ষড়যন্ত্র। আজ-জাওয়াহেরী দাবী করেন দাওলাতে ইসলাম পূর্ব হতেই তার হাতে বায়াত ছিল কিন্তু তারা তার অবাধ্য হয়েছে। এর ফলে উল্টো দাওলাতুল ইসলামকে আমীর অমান্য করার অপবাদ দেওয়া হয়।

দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে এ বায়াতকে অস্বীকার করা হয় এবং এর বিপরীতে স্বয়ং আজ-জাওয়াহেরীর মুখের বক্তব্যে দাওলাতুল ইসলামের কথা সত্য প্রমাণিত হয়। এসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আল-কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং জিহাদী আলেম হিসেবে পরিচিত বহু সংখ্যক চিন্তাবিদ অন্ধের মতো কেবল দাওলাতে ইসলামকে দোষারোপ করতে থাকে। তাকফিরী, রক্তপিপাসু, খারেজী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে তারা দাওলাতে ইসলামের নিন্দা মন্দ করতে থাকে। তাদের মধ্যে আল-মাকদেসী, আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী, হানী আস-সুবায়ী, তারিক আব্দুল হালিম প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এসব ব্যক্তিবর্গের কেউই ইরাক বা সিরিয়ার জিহাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। সেখানে বাস্তবে কি ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের সরাসরি কোনো অভিজ্ঞতা নেই। নিজেদের মতামত বর্ণনা করার সময় উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত বক্তব্য বর্ণনা করে তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে অমুক আমাকে বলেছে বা আমি শুনেছি এই সব কথাবার্তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাদের কিছু অন্ধ মুকাল্লিদ রয়েছে যারা চোখ-কান বুজে তাদের অনুসরণ করেন। এমন কিছু লোক আমাদের দেশেও রয়েছে। আমি তাদের অনুরোধ করবো উপরোক্ত আলোচনা মনোযোগ সহকারে পাঠ করার জন্য। হয়তো এতে তাদের চোখ খুলবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

খেলাফত ঘোষণার পূর্ব প্রেক্ষাপট

কাফির-মুশরিক এবং তাদের অনুসারীরা পূর্ব থেকেই দাওলাতুল ইসলামের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। এরপর নিজের ঘরের লোক তথা আল-জুলানীর এবং তার দল দাওলাতে ইসলামের বায়াত ভঙ্গ করলে সেই সাথে বিশ্বের মুজাহিদদের

অভিভাবকের মর্যাদায় যার অবস্থান সেই ব্যক্তি এই প্রতারকের পক্ষ নিলে শামে দাওলাতে ইসলাম সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। সবাই দাওলাতে ইসলামকে নিন্দা করতে থাকে। বাতিলপন্থীরা নিন্দা করে বাইরের দেশ থেকে সিরিয়াতে অনুপ্রবেশের কারণে আর ইসলাম পন্থীরা নিন্দা করে তথাকথিত স্বঘোষিত আমীরের নির্দেশ অমান্য করার কারণে। এ অবস্থায় ইসলামের শত্রুরা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। যেসব বিদ্রোহীরা সিরিয়ায় তাগুতী শাসনের অবসান ঘটিয়ে আরেকটি তাগুতী শাসন প্রতিষ্ঠা করার স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিল এবং যেসব নামধারী মুজাহিদরা মুখে ইসলামের কথা বললেও কার্যত বহির্বিশ্বের তাগুতী শক্তির তারা প্রভাবিত এবং তাদের মদদপুষ্ট ছিল তারা একযোগে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করে। তারা বিশেষ করে মুহাজিরদের তথা সিরিয়ার বাইরে থেকে আসা মুজাহিদদের আক্রমণ করতো।

একই সাথে জাওয়াহেরী প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়ে বা গোপনে পত্র পাঠিয়ে বারবার দাওলাতে ইসলামকে ইরাকে ফিরে যাওয়ার জন্য আনুরোধ করছিলেন। এভাবে কেউ বুঝিয়ে-শুনিয়ে আর কেউ জোর করে দাওলাতে ইসলামকে সিরিয়া থেকে বের করে দিতে চাচ্ছিল।

সেই দুঃসময়ে কেউ দাওলাতে ইসলামের পক্ষ নেই নি। তাদের উপর যে জুলুম করা হয়েছিল তার প্রতিবাদে কেউ টু শব্দ করে নি। তাদের সহযোগিতায়ও কেউ এগিয়ে আসে নি। উল্টো অন্ধের মতো সবাই যে কোনো ঘটনার দায়ভার দাওলাতে ইসলামের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল।

এমতাবস্থায় ৩০-সেপ্টেম্বর-২০১৩ ইং তারিখে আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানীর পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য বের হয়। যার শিরোনাম- আল্লাহই তোমার পক্ষে আছে হে নির্যাতিত রাষ্ট্র (لك الله أيتها الدولة المظلومة)।

এই বক্তব্যে তিনি দাওলাতে ইসলামের উপর যে অপবাদ দেওয়া হয় সেগুলোর উত্তর দেন এবং দাওলাতে ইসলামের সাথে অন্যান্য জিহাদী সংগঠনসমূহের যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ বিশ্লেষণ করেন। প্রথমেই মিডিয়ার চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি বলেন,

— দাওলাতে ইসলাম যখন সিরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে বড় কোনো অভিযান পরিচালনা করে তখন তারা তা গোপন করে আর দাওলাতে ইসলামের সাথে অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপের কোনো সংঘর্ষ কলে সেটা তারা ফলাও করে প্রচার করে। তা যতই ছোট হোক। তাছাড়া তারা দাওলাতে ইসলামের উপর বিভিন্ন ভীত্তিহীন অপবাদ দেয়।

যেমন সুন্নীদের মসজিদে বোমা ফাটানো, মানুষের চামড়া ছিলে নেওয়া, নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা, মুসলিমদের তাকফিরর করা ইত্যাদি। তিনি এসব ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেন।

— এরপর তিনি সধারন মুসলিমদের তাকফীর করার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমাদের সৈন্যদের মধ্যে যারা এমনটি বলে তাদের প্রথমে বোঝানো হয় সেটা না মানলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

— অন্যান্য জিহাদী গ্রুপের সাথে সংঘর্ষে ব্যাপারে প্রথমেই তিনি ঐ সকল দলের নানা রকম অবৈধ কার্যকলাপ তুলে ধরেন। তার মধ্যে ফ্রান্স বা আমেরিকার সাথে তাদের সম্পর্ক। দাওলাতে ইসলামের মুজাহিদদের হত্যা করা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তারাই আগে শুরু করেছে আর দাওলাত কেবল আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে।

বিভিন্ন জিহাদী সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকলে। ৭ ই জানুয়ারী ২০১৪ ইং তারিখে জাবহাতুন নুসরার আমীর শামের ভূমিতে আল্লাহকে ভয় করো শিরোনামে একটি বক্তব্য প্রকাশ করেন।

সেখানে তিনি চলমান বিরোধ সম্পর্কে বলেন,

نحنُ إذ نعتقدُ بإسلامِ الفصائِلِ المتصارعةِ رَغمَ استغلالِ بعضِ الأطرافِ الخائنةِ للحالةِ الراهِنة لِتنفيذِ مأربٍ غَربي أو مَصلَحةٍ شَخصيةٍ واهِنة، وعليه فإنَّ القِتالَ الحاصلَ نراهُ في غالِبهِ قِتالَ فِتنةٍ بينَ المسلمين..وقد حذرَ اللهُ تعالى وعَظَمَ حُرمةَ الدَّمِ المسلِم تَعظيماً شَديدا

যদিও কিছু প্রতারক মহল বর্তমান অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে পশ্চিমা স্বার্থের অধীনে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করছে তবে যেহেতু সংঘর্ষে লিপ্ত সংগঠনসমূহকে আমরা মুসলিম মনে করি তাই চলমান সংঘর্ষকে আমরা মুসলিমদের মাঝে ফিতনার যুদ্ধ মনে করি। আর মহান আল্লাহ মুসলিমদের রক্ত ভীষণভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন।

এরপর তিনি মুসলিমের রক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি দলিল প্রমাণ পেশ করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই সংঘর্ষের মাধ্যমে কেউ কেউ পশ্চিমাদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং এরা কারা হতে পারে সে বিষয়ে আমরা আল-জুলানীর অন্য কথার মধ্যে ইঙ্গিত পায়। যেহেতু তিনি বলেছেন শামের অনেক জিহাদী সংগঠন বহির্বিশ্বের সহযোগিতা গ্রহণ করে এবং তাদের দ্বারা

পরিচালিত হয়। কিন্তু এ ধরণের একটা দলের সাথে যদি আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চায় এমন একটা দল যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে দুটি দলই মুসলিম এই যুক্তিতে তাদের যুদ্ধকে ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করা এবং কোনো পক্ষকে সহযোগিতা না করা কিভাবে বৈধ হয়? যে দলটি ইসলামী হুকুমত চায় আর যে দলটি তা চায় না উভয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে প্রথম দলটিকে সহযোগিতা করা কি আবশ্যক নয়?

এরপর তিনি বলেন,

لقد جرتِ الكثيرُ من الاعتداءاتِ في الساحةِ بين الفصائلِ المسُلحة، وتجاوزاتٌ من بعضِ الفصائل، كما أنَّ السياسةَ الخاطئة التي تتبعُها الدولةُ في الساحة، كان لها دورٌ بارزٌ في تأجيج الصِراع

বিভিন্ন সসস্ত্র গ্রুপের মধ্যে এখানে অনেক জুলুম-নির্যাতন হচ্ছে। কোনো কোনো জিহাদী গ্রুপ সীমা লঙ্ঘন করছে। দাওলাত এখানে যে মূলনীতি অনুসরণ করছে যুদ্ধের আগুণ জ্বালানোর ক্ষেত্রে সেটাই প্রধান ভূমিকা রাখছে।

দেখা যাচ্ছে, জুলুম নির্যাতন ও সীমা লঙ্ঘন বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে হচ্ছে এটা স্বীকার করার পরও তিনি তাদের কারও নাম ধরে উল্লেখ করেননি কিন্তু দাওলাতে ইসলামের নাম ধরে কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই মূল দোষ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায় দলীল প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে কাফির-মুশরিকরা এবং তাদের অনুগত মিডিয়া, তাগুতের অনুসারী নামধারী জিহাদী সংগঠনগুলো তো বটেই এমনকি আল-কায়েদার অনুসারী মুজাহিদ নেতা ও জিহাদী আলেম-ওলামারাও সবার আগে দাওলাতে ইসলামের নামটা সরাসরি উচ্চারণ করতেন। অন্যান্যদের দোষ থাকলেও সেটা স্বীকার করতেন না। স্বীকার করলেও সেটা পরোক্ষভাবে, নাম উল্লেখ না করে বা সম্মানে সাথে। কিন্তু দাওলাতের ইসলামের ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দোষারোপ করতেন। এভাবে দলীল ছাড়া দোষারোপ করার কারণে সত্য সম্পর্কে অবগত যে কারও নিকট তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এমন কি তাদের নিজের কথা নিজের সাথেই সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হয়েছে। যার কিছু উদাহরণ আমরা পূর্বে দিয়েছে পরবর্তীতেও এমন কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

যাই হোক, লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা না করেই কেবল বাশার আল-আসাদের সাথে যুদ্ধ করছে এই যুক্তিতে শামে বিদ্যমান সকল সংগঠনকে মুজাহিদ হিসেবে গণ্য করার

কারণে তাদের সাথে দাওলাতে ইসলামের যুদ্ধ-বিগ্রহকে আল-জুলানী ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যদি তিনি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করতেন তবে বুঝতে পারতেন বাশার আসাদের সাথে যারা যুদ্ধ করছে তাদের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা বাশার আসাদের পতন ঘটানোর পর বাশার আসাদের মতোই তাগুতী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেমন জায়শে হুর তথা ফ্রী সিরিয়ান আর্মি এবং অন্য কিছু দল। তাদের মধ্যে এমন কিছু দলও আছে যারা বাইরের তাগুতী রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যা আল-জুলানী নিজেই স্বীকার করেছেন। অতএব বাইরের প্রভুদের পছন্দ মতো রাষ্ট্রই যে তারা প্রতিষ্ঠা করবে তাতে সন্দেহ করা যায় না। বুদ্ধিমান যে কেউ এটা বুঝতে সক্ষম যে শামে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাশার আসাদের সাথে সাথে এই সকল বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করাও জরুরী। তা না করে এসব তাগুতের এজেন্টকে মুজাহিদ হিসেবে গণ্য করলে এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করলে বাশার আসাদের সাথেই বা যুদ্ধ করার কি দরকার? সেটাও তো একটা ফিতনা। এর চেয়েও বড় ফিতনা এসব বাদ-বিবাদের দায়ভার তাগুতের পক্ষাবলম্বনকারীদের পরিবর্তে দাওলাতে ইসলামের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

দাওলাতুল ইসলাম কি শরিয়তের বিচার অমান্য করেছিল?

এরপর আল-জূলানী এসব বাদ-বিবাদের সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি শারয়ী বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন যা মুজাহিদদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সংঘটিত বাদ-বিবাদে শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করবে। শেষে তিনি বলেন,

وتنصُ الجماعاتُ على الوقوفِ صفاً واحداً وبالقوة أمامَ كُلِّ مَن لا يلتزمُ بقضاءِ اُللجنةِ الشرعيةِ بعدَ إقرارهم فيها حتى تفيءَ إلى أمرِ الله،

সকল দলকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, যারা এই শারয়ী বোর্ড গঠনে একমত হওয়ার পরও তার ফয়সালা মেনে নেবে না সকলে একতাবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে।

পরবর্তীতে ২৩ জানুয়ারী ২০১৪ ইং তারিখে জাবহাতুন নুসরা এবং অন্যান্য জিহাদী সংগঠনসমূহের নিকট বিশ্বস্ত ব্যক্তি আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনি সকলের সামনে এ ধরণের একটি শারয়ী বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব করেন এবং তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা

করেন।

যেসব সংগঠন শারয়ী আইন চায়না তাদের বৈধ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েই এই শারয়ী বোর্ড গঠন করা হচ্ছিল। অর্থাৎ এ সকল সংগঠনের সাথে লড়াই করাও এই শারয়ী বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ ছিল। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে, এই শারয়ী বোর্ড অনুযায়ী সেটাকে অপরাধ সাব্যস্ত করে বিচার করা হতো। অথচ ইসলামী শরিয়তে তাগুতী সরকার বাশার আসাদের সাথে যুদ্ধ করা যেমন বৈধ তেমনি যারা নতুন একটি তাগুতী শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাশার আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের সাথে যুদ্ধ করাও বৈধ। অতএব শরীয়তের আলোকে এটা বিচারের আওতায় আসতে পারে না। এছাড়া দেখা গেলো শরীয়তের আইন যারা চায় না তারাই সর্বপ্রথম এই শারয়ী বোর্ড গঠনে সম্মতি জানালো। এটাই প্রমাণ করে তথাকথিত এই শারয়ী বোর্ডে কি পরিমাণ অনিয়ম ছিল।

এসব কারণে দাওলাতে ইসলাম তথাকথিত এই শারয়ী বোর্ডে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। সাথে সাথেই শুরু হয় নতুন অপপ্রচার। সবাই বলতে থাকে দাওলাতে ইসলাম মুখে শরীয়তের বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলে কিন্তু শরীয়তের বিচার মানে না। তারা বারবার এই আয়াতটি পাঠ করতে থাকে,

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: ٥١]

মুমিনদের যখনই আল্লাহ ও তার রাসুলের বিচারের দিকে ডাকা হয় তারা বলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম। [নুর/৫১]

সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষের লোকেরা দাওলাতে ইসলামকে শরীয়তের বিচার অমান্য করার অপবাদ দিয়ে থাকে।

৭ মার্চ ২০১৪ তে ‘এসো আমরা মুবাহালা করি এবং মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিসাপ দিই” এই শিরোনামে প্রকাশিত একটি বক্তব্যে আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী বলেন,

اللهمَّ ويزعمون أنّ الدولةَ ترفضُ التحاكُمَ لشرعِ الله، فما أقبَحها من فِرية! وهَل تُقاتِلُ الدولةُ الغربَ والشرقَ والأسودَ والأحمَر، وتعضُّها السيوفُ إلاّ لتحكيمِ شرعِ الله! إنّ الدولةَ الإسلامية لا ترفضُ التحاكُمَ لشرعِ الله، ومَن يرفضُ التحاكُمَ لشرعِ الله يكفُرْ. وإنّما جعلَ هؤلاء السفهاء مبادراتِهم هيَ شرعُ الله، ومَن رَدّها لأيِّ سببٍ شرعيٍّ فقَدْ ردَّ شرعَ الله!

হে আল্লাহ! এরা দাবী করে দাওলাত শরীয়তের বিচার মানতে অস্বীকার করে। এটা কত জঘন্ন অপবাদ। দাওলাতে ইসলাম তো শরীয়তের বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই পূর্ব-পশ্চিম, সাদা-কালো সবার সাথে যুদ্ধ করছে। দাওলাতে ইসলাম তো শরীয়তের বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তরবারি ধরেছে। দাওলাতে ইসলাম শরীয়তের বিচার মানতে অস্বীকার করে না। যে কেউ শরীয়তের বিচার মানতে অস্বীকার করে সে কাফির। এসব বোকা লোকেরা আসলে তাদের প্রস্তাবকেই শরীয়তের বিচার হিসেবে গণ্য করেছে আর যে কেউ কোনো কারণে তাদের প্রস্তাবকে বর্জন করে তাকে শরীয়ত বর্জন করা হিসেবে গণ্য করছে।

এর পর তিনি বলেন,

إنّ الدولةَ لَمْ ترفُضْ يوماً التحاكُمَ لشرعِ اللهِ، معاذَ الله! وقد خضعَتْ للمحكمة المشتركة ولم تردّها أو تتكبّر عليها يوماً

দাওলাতে ইসলাম কখনও শরীয়তের বিচার অমান্য করে না। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়। এর পূর্বে আমরা উভয় পক্ষের বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে ফয়সালা করেছি। সেসব ফয়সালা আমরা অমান্য করি নি এবং তার উপর ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণও করি নি।

এরপর তিনি জাবহাতুন নুসরা ও অন্যান্য দলের সাথে বিভিন্ন ঘটনায় উভয় পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে যৌথ বিচারের আয়োজন করার উদাহরণ দিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবে যে ধরণের বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে বলেন,

كلاّ، ولكنّ القومَ رفَضوا المحكمة المشتركة، وجاؤوا بمكرٍ ومؤامرة ومكيدة، جعلوا فيها مبادراتهم شرعَ الله، ورفضها رفضاً لشرع الله، وسيفاً مصلتاً على الدولة.

نعم، ولربما يكون أول حكمٍ لتلك المحكمة المستقلة التي تدعو إليها تلك المبادرات، خروج الدولة من الشام -كما صرّح بذلك أحد كبرائهم على الفضائيات- وتسليمها للضباع والثعالب والذئاب، للخونة واللصوص والغادرين،

কিন্তু এরা এ ধরণের যৌথ বিচার পরিত্যাগ করে একটি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তারা নিজেদের প্রস্তাবকে আল্লাহর শরীয়ত বলে মনে করছে। আর এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করাটা আল্লাহর শরীয়তকে অস্বীকার করা বলে ঘোষণা করছে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তারা দাওলাতে ইসলামের কাধের উপর উম্মুক্ত তরবারির ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই প্রস্তাবে যে শারয়ী বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে হয়তো এই বোর্ডের প্রথম বিচারই হবে দাওলাতুল ইসলামকে সিরিয়া থেকে ইরাকে ফিরে যেতে বলা। যেমনটি তাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মিডিয়াতে ঘোষণা করেছে। এভাবে

তারা দাওলাতে ইসলামের দখলকৃত এলাকা বাঘ, শৃগাল এবং চোর ও প্রতারকের হাতে ছেড়ে দিতে বলবে।

আল-আদনানীর উদ্দেশ্য হলো, দুটি দলের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদে মিমাংসার প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে উভয় পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগ করে যৌথ বিচারের আয়োজন করার মাধ্যমে বিচার পরিচালনা করতে হবে। এটা দাওলাত অস্বীকার করে না। কিন্তু কোনো একটা বোর্ড গঠন করে তার হাতে যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব নয় যেহেতু এমন সম্ভাবনা আছে যে উক্ত বোর্ডের পক্ষ থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে যা দাওলাতে ইসলামকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

আল-আদনানী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলেছেন তা হলো, এই প্রস্তাবে যে পদ্ধতির বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এই পদ্ধতিটা তো স্বয়ং শরীয়তের বিধান নয়। বরং এটা কিছু লোকের প্রস্তাব। এটা অমান্য করা অর্থ শরীয়তের বিচার অমান্য করা এমন যারা মনে করে তিনি তাদের বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটা অবশ্যই যথার্থ মন্তব্য।

ইসলামের ইতিহাসে শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করার দুটি পন্থা পাওয়া যায়।

ক. খলীফা বা সুলতানের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কাজির বিচারের মাধ্যমে।

খ. বিবাদমান দুটি পক্ষ একেক জনের পক্ষ থেকে একেক জনকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে এবং উভয়ে যে সিদ্ধান্ত একমত হয় তা গ্রহণ করার মাধ্যমে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হলে উভয়ের আত্মীয়দের মধ্যে থেকে দুজন বিচারক নিয়োগ করা সংক্রান্ত আয়াত এবং আলী ﷺ ও মুয়াবিয়া ﷺ এর বিবাদের সময় উভয় পক্ষ দুজন বিচারক নিয়োগ করার ঘটনায় এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। দাওলাতে ইসলাম এ ধরণের বিচার ব্যবস্থা স্বীকার করেছে এবং অন্যান্য গ্রুপের সাথে বিভিন্ন ঘটনায় এ ধরণের বিচার ব্যবস্থার আয়োজন করেছে বলে প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ এতে সন্তুষ্ট হয় নি বরং তারা চেয়েছে এমন একটা বোর্ড গঠন করতে যারা মুজাহিদদের মাঝে বিবাদমান যে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করবে যা সকলে মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। যে মেনে নেবে না তার বিরুদ্ধে অন্যরা যুদ্ধ করে তাকে মানতে বাধ্য করবে। এধরণের একটা প্রস্তাব মেনে নেওয়া অর্থ হলো, নিজের কাধের উপর

তরবারি ঝুলিয়ে রাখা যেহেতু তারা কখন কি রায় দেয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাছাড়া যারা এই বোর্ড গঠন করছেন তাদের উপর পরিপূর্ণ আস্থাও রাখা যায় না। তবু এটাকে অমান্য করার কারণে দাওলাতুল ইসলামকে শরীয়ত অমান্য করার অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, মুসলিমদের মধ্যে একাধিক দল বা মত সৃষ্টি হলে এবং তাদের মধ্যে বাদ-বিবাদ হলে সকলে মিলে একটা বোর্ড গঠন করে বিচার করাটাই কি শরীয়তের নির্দেশ নাকি সকলে মিলে একজনকে খলীফা বা শাসক হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিমদের মাঝে একতা রক্ষা করাটা শরীয়তের নির্দেশ?

এর উত্তর কিন্তু সবার জানা। বিভিন্ন দল ও উপদল টিকিয়ে রেখে কেবল সবার সম্মতি নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করে বিচার করার পরিবর্তে সকল প্রকার বাদ-বিবাদ ও দলাদলি থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিম উম্মাহকে এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করাটাই শরীয়তের সঠিক বিচার।

উপরোক্ত প্রস্তাবের পরিবর্তে দাওলাতে ইসলাম কিন্তু হুবহু এই প্রস্তাবই পেশ করেছিল।

২ মে ২০১৪ সালে শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরাক্ষা শিরনামে আর-জাওয়াহেরী একটি বক্তব্য প্রকাশ করেন যাতে আল-কায়েদার নিকট দাওলাতে ইসলামের বায়াত প্রমাণের চেষ্টা করেন। উক্ত পত্রে তিনি জাবহাতুন নুসরাকে নিরোপেক্ষ শারয়ী আদালতের অধীনস্ত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং দাওলাতূল ইসলামকে ইরাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। উক্ত বক্তব্যের উত্তরে **১১**-মে-২০১৪ ইং তারিখে আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী " দুঃক্ষিত হে আল-কায়েদার আমীর" শিরনামে একটি বক্তব্য প্রকাশ করেন। মুজাহিদদের মধ্যে মিমাংসার জন্য নিরপেক্ষ শারয়ী আদালত গঠনের বিষয়টি অসম্ভব হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এর কারণ সম্পর্কে বলেন,

لأنكَ شققت المسلمين شقّين لا ثالثَ لهُما؛ شقّ مع الدولة وأنصارها، وشقّ مع الفرق المطالبة بالمحكمة المستقلّة، فلا توجد على وجه الأرض هيئةٌ مؤهَّلَةٌ مستقلّة يرضى بها الطرفان

কারণ আপনি (আল-জূলানীর বায়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে) মুজাহিদদের দুটি দলে বিভক্ত করে ফেলেছেন। এখানে তৃতীয় কোনো দল নেই। মুজাহিদরা হয়তো দাওলাতের পক্ষে এবং তার সহযোগী অথবা ঐ সকল দলের পক্ষে যারা নিরপেক্ষ আদালত গঠন করতে চাচ্ছে। পৃথিবীতে এখন এমন কোনো বোর্ড নেই যার উপর

দুই পক্ষই আস্থা রাখে।

এরপরই তিনি বলেন,

ثمّ ألا أدلّكم على خيرٍ وأيسَرْ؟

أمرٌ لو يفعلهُ المسلمون أفلَحوا كلّ الفلاح، أليسَ في المسلمين رجلٌ صالِح؟ أليسَ في المسلمين رجلٌ مُؤهَّل؟

أليسَ في المسلمين على وجه الأرض رجلٌ رشيد يختاره المسلمون فيُعلِنَ على الملأ كفرَهُ بالطاغوت والبراءة من الكفر والشرك وأهله ويُعلن بغضاءَهُ لهُم وحربَهُ عليهِم، فنُبايعه على ذلك وننصّبه خليفة، فنُقاتِلُ مَنْ عصاهُ بمن أطاعَه، في العراق والشام والجزيرة ومصر وخراسان والأرض جميعاً، فنُنهي هذا التشرذم وهذا الاختلاف، ونُفرِحَ المؤمنين ونُغيظ الكافرين، فلا تبقى إمارةٌ شرعيّةٌ غيرُه.

هذا هو الحلّ، ولا حلّ سواه، فيكون أوّل واجبٍ لذلك الخليفة تشكيل تلك المحكمة التي تدعونا لها، هذا هو الحل الوحيد، وهذا حلٌّ يسير لا يُوجد أيُّ مانعٍ شرعيٍّ يحولُ دونَه، بل هو واجب العصر الذي يتخلّفُ عنه المسلمون، هذا هو داؤنا ودواؤُنا.

আমি আপনাদের নিকট এর চেয়ে সহজ ও উত্তম বিষয়ের প্রস্তাব করছি। যদি মুসলিমরা এটা করে তবে সফল হয়ে যাবে। মুসিলদের মধ্যে কি কোনো নেককার ব্যক্তি নেই তাদের মধ্যে কি কোনো যোগ্য ব্যক্তি নেই? সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে কি এমন একজন সত্যপন্থী লোক নেই যাকে মুসলিমরা বাছায় করবে। ঐ ব্যক্তি মানুষের সামনে শিরক-কুফর এবং তাগুত ও তার অনুসারীদের বর্জন করার ঘোষণা দেবেন এবং তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবেন ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। এসব শর্তে আমরা তার নিকট বায়াত হবো। এবং তাকে খলীফা হিসেবে মনোনিত করবো। ইরাক, সিরিয়া, জাজিরা (সৌদি আরব), মিসর, খুরাসান সহ সারা বিশ্বে যারা তার আনুগত্য করে তাদের সাথে নিয়ে যারা তার অবাধ্য হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। এভাবে আমরা এই দলাদলি এ বিভক্তি বন্ধ করবো। এতে মুমিনরা খুশি হবে আর কাফিররা বেজার হবে। খেলাফত ছাড়া অন্য কোনো দল বৈধ থাকবে না। এটাই হলো সমাধান এ ছাড়া অন্য কোনো সমাধান নেই। ঐ খলীফার উপর প্রথম দায়িত্ব হবে এমন একটি আদালত গঠন করা যা আপনারা দাবী করছেন। এটাই একমাত্র সমাধান। একটা সহজ সমাধান। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। বরং মুসলিমদের উপর বর্তামান যুগে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব যা তারা পরিত্যাগ করেছে। এখানেই আমাদের রোগ আর এখানেই চিকিৎসা করতে হবে।

এ বিষয়ে আল-আদনানীর প্রস্তাবনা শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে এবং বাস্তবতার

নিরীখে পূর্বের প্রস্তাবের চেয়ে অধিক সঙ্গত। কেননা মুসলিমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত আছে বলেই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিজেদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চলছে। একটি নিরপেক্ষ শারয়ী আদালত যদি গঠন করা সম্ভবও হয় তবু সেটা কেবল সংঘর্ষ বাধলে বিচার করবে কিন্তু যে কারণে সংঘর্ষ বাধছে তথা দলে দলে বিভক্ত হওয়া সেটার কোনো সমাধান হবে না। অর্থাৎ মূল রোগটি থেকেই যাচ্ছে। তার কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না। এ পন্থায় তাই সংঘর্ষ বন্ধ করা সম্ভব নয় বরং সংঘর্ষ চলতেই থাকবে আর বিচারও চলতে থাকবে। কিন্তু সকল সংগঠনকে একজন খলীফার অধীনে একত্রিত করে খেলাফত কায়েম করা হলে মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ কেটে যাবে ফলে সংঘর্ষও থাকবে না। এটাই শরীয়তের নির্দেশ। যা বাস্তবায়নের জন্য আল-আদনানী প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় নি। তার প্রস্তাবের দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপও করে নি। তখন কিন্তু ঐ সকল সংগঠনকে কেউ বলেনি এরা শরীয়তের বিচার অমান্য করছে।

প্রশ্ন হলো, কোনটি শরিয়তের বিচার? মুসলিমদের বিভক্ত রেখে কেবল একটা নিরপেক্ষ আদালত প্রতিষ্ঠা করা নাকি খেলাফত কায়েম করা? তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে আসলে কারা শরীয়তের বিচার অমান্য করেছিল?

অথচ তারাই আবার দাওলাতে ইসলামকে শরীয়তের বিচার অমান্য করার অপবাদ দিচ্ছিল।

এমন অনেক অপবাদ অন্যায়ভাবে দাওলাতে ইসলামের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপবাদটি হলো, আবু খালিদ আস-সুরীকে হত্যার অপবাদ। ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ইং তারিখে আবু খালিদ আস-সুরী নিহত হন। দাওলাতের ইসলামের বিরোধী পক্ষের নিকট তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। আজ-জাওয়াহেরী জাবহাতুন নুসরা এবং দাওলাতে ইসলামের মধ্যে যে মিমাংসা করেছিলেন বলে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি উক্ত মিমাংসাতে আবু খালিদ আস-সুরীর উপর যে কোনো সমস্যা সমাধানের দায়ভার অর্পণ করেন। এই ঘটনাটি ঘটার পরই দাওলাতে ইসলামের শত্রুরা এটাকে ব্যবহার করে সকল মুজাহিদদের দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করে। এ উদ্দেশ্যে ঘটনার পরপরই কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই সবাই ঘটনাটি দাওলাতুল ইসলামের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এমন কি আল-জুলানীও একটি বক্তব্যে দাওলাতে ইসলামকে এ ঘটনার জন্য দায়ী

ঘোষণা করে এবং তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে।

পরবর্তিতে দাওলাতে ইসলাম এ বিষয়টি অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের কথার প্রতি কেউ কর্ণপাত করেনি। সবাই কেবল মিথ্যা অপবাদকেই যে কোনোভাবে সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

কাঙ্খিত খেলাফতের ঘোষণা

ইতোমধ্যে দাওলাতে ইসলাম ইরাক ও সিরিয়াতে বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ বিজয় অর্জনে সক্ষম হয় এবং শক্তিশালী অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে ১০ জুন ২০১৪ ইং তারিখে। এ দিন ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মুসল দাওলাতে ইসলামের দখলে চলে আসে। দাওলাতে ইসলাম অল্প কিছু সৈন্য (প্রায় চার শত) নিয়ে মুসলে আক্রমণ করলে বিপুল সংখ্যক (ত্রিশ হাজারের মতো) ইরাকী বাহিনী সব অস্ত্র সরঞ্জাম ফেলে প্রাণপনে পলায়ন করে। এতে বিপুল পরিমাণ শক্তি ও সম্পদ দাওলাতে ইসলামের হস্তগত হয়।

এর কয়েকদিন পর ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে সীমান্ত ভেঙে দেওয়ার ভিডিও প্রকাশ করা হয়। এভাবে এই প্রজন্মের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বের কাফির শক্তির বেধে দেওয়া সীমানাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং সকল সীমানা-প্রাচীরের উর্ধে ইসলামী খেলাফত ঘোষণার জন্য ইরাক ও শামের ভূমিকে প্রস্তুত করা হয়।

এরপর মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ২৯ জুন ২০১৪ ইং, ১৪৩৫ হিজরীর পহেলা রমজানে দাওলাতে ইসলামের পক্ষ থেকে আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে “এটা আল্লাহর ওয়াদা” এই শিরোনামে একটি বক্তব্য প্রকাশ করেন। তাতে তিনি কাঙ্খিত সেই খেলাফতের ঘোষণা দেন।

প্রথমেই তিনি এই আয়াতটি তেলোয়াত করেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٥٥]

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের তিনি পৃথিবীতে ক্ষমতা দেবেন যেভাবে তাদের পূর্বের লোকদের দেওয়া হয়েছিল। এভাবে তিনি তাদের জন্য যে দ্বীনকে মনোনিত করেছেন তা

প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাদের পূর্বের ভয় ও অনিরাপত্তাকে পরিবর্তন করে নিরাপত্তা দেবেন। তারা আমার ইবাদত করে এবং আমি ছাড়া কাউকে শরীক করে না। যে কেউ এর পর অস্বীকার করে তারাই প্রকৃত অপরাধী। [নুর/৫৫]

এরপর তিনি বলেন,

নেককার মুমিনদের পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা দেওয়া আল্লাহর একটা ওয়াদা তবে এর জন্য শর্ত হলো সকল প্রকার শিরকী কাজ থেকে দূরে থাকা। শাসন ক্ষমতা কেবল রাজত্ব করা বা বিজয় অর্জনের জন্য নয় বরং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবরং মানুষকে আল্লাহর দ্বীন মানতে বাধ্য করার জন্য। এ কারণেই মুসলিমদের সর্বোত্তম উম্মত বলা হয়েছে। এই শর্ত পুরণ করলে এই উম্মতকে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এরপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা বর্ণনা করেন। তারা ইসলাম পূর্ব যুগে যে অপমান ও অবহেলার মধ্যে ছিল এবং ইসলাম আসার পর সে সম্মান প্রাপ্ত হয়েছিল সেটা বর্ণনা করার পর বলেন,

إن الله يفتح لهذه الأمة في سنة ما لا يفتحه لغيرها في سنين بل قرون

মহান আল্লাহ এই উম্মতের জন্য এক বছরে যতটা বিজয় দেন অন্য কোনো উম্মতকে কয়েক বছরে বরং কয়েক শত বছরে ততটা বিজয় প্রদান করেন না।

এরপর তিনি এর উদাহরণ দিয়ে বলেন, মাত্র ২৩ বছরে ইতিহাসের সর্ব বৃহৎ দুটি সম্রাজ্য (রোম ও পারস্য সম্রাজ্য) মুসলিমদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর এই উম্মত পৃথিবীতে জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শতাব্দির পর শতাব্দি পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেছে। এটা তারা নিজেদের শক্তি বা বুদ্ধির বলে করে নি বরং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রসুলের আদর্শ অনুসরণের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।

এপর তিনি বলেন,

يا أمة محمد صلي الله عليه وسلم لا زلت خير أمة ولا زالت لك العزة ولتعودن لك السيادة وإن إله هذه الأمة بالأمس هو إلهها اليوم وإن الذي نصرها بالأمس ينصرها اليوم

হে উম্মতে মুহাম্মাদ ﷺ তুমি এখনও সর্বোত্তম উম্মত। এখনও তোমার জন্য রয়েছে সম্মান। তোমার হাতে আবার পৃথিবীর নেতৃত্ব আসবে। অতীতে এই উম্মতের যিনি

ইলাহ ছিলেন আজও তিনিই আছেন। অতীতে এই উম্মতকে যিনি সাহায্য করেছেন আজও তিনিই সাহায্য করবেন।

এরপর তিনি বলেন, অতএব সময় হয়েছে সকল প্রকার অপমান ও লাঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়ার এবং ঘুম থেকে জেগে উঠার। এখন আর কান্না-কাটির সময় নেই এখন সুসংবাদের বার্তা চলে এসেছে এবং বিজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এই যে দেখ দাওলাতে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়ছে। তার ছায়ায় ইরাকের দিয়ালা থেকে সিরিয়ার হালাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসিত হচ্ছে। এখানে মুসলিমরা সম্মানিত হচ্ছে কাফিররা অপমানিত হচ্ছে। কাফিরদের সৈন্যরা বন্দি হচ্ছে অথবা নিহত হচ্ছে। কাফিরদের সীমানা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহর সকল বিধান কায়েম করা হচ্ছে। ক্রুশ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কবর সমান করে দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম বন্দিদের কাফিরদের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দাওলাতে ইসলামের ভূখন্ডে মানুষ নিরাপদে বসবাস করছে। বিভিন্ন এলাকাতে গভর্ণর নিয়োগ করা হয়েছে, কাজি নিয়োগ করা হয়েছে, অমুসলিমদের উপর জিজিয়া আরোপ করা হয়েছে, মুসলিমদের নিকট যাকাত আদায় করা হয়েছে। বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মুনকার কাজ বন্ধ করা হয়েছে এবং মসজিদে দ্বীনি ইলমের দারস ও হালাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় এখানে দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে গেছে। শুধু একটা বিষয় বাকী আছে। এটা একটা ফরজে কিফায় যা পরিত্যাগ করলে সমগ্র উম্মাত পাপী হবে। এমন একটা ফরজ যা মানুষ ভুলে গেছে। এটা পরিত্যাগ করার পর থেকে এই উম্মত কখনও সম্মান অর্জন করতে পারে নি। এমন একটা বিষয়, প্রতিটি মুসলিম অন্তরে যার স্বপ্ন দেখে। আর সেটা হলো খিলাফত। সেটা হলো খিলাফত। একটি ফরজ কাজ যা বর্তমান যুগের মানুষ পরিত্যাগ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: ٣٠]

যখন আপনার রব ফেরেস্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করবো।

[বাকারা/৩০]

এরপর তিনি ইমাম কুরতুবীর এই কথাটি উল্লেখ করেন,

هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي نَصْبِ إِمَامٍ وَخَلِيفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ، لِتَجْتَمِعَ بِهِ الْكَلِمَةُ، وَتَنْفُذُ بِهِ أَحْكَامُ الْخَلِيفَةِ. وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَلَا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْأَصَمِّ

এই আয়াতে একজন ইমাম তথা খলীফা নিয়োগ করার ব্যাপারে মূলনীতি রয়েছে।

যার কথা শোনা হবে এবং মানা হবে। যাতে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ থাকে। এবং খলীফার যেসব কাজ (হদ কায়েম করা, বিচার ফয়সালা করা ইত্যাদি) সেগুলো তিনি আদায় করেন। এটা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইমামদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কেবল আসম (একজন ব্যক্তি) ছাড়া যেহেতু সে শরিয়তের ব্যাপারে আসলেই আসম (কালা) ছিল। [তাফসীরে কুরতুবী]

এরপর তিনি বলেন,

একারণে যখন দাওলাতে ইসলাম খিলাফতের ঘোষণা দেওয়া মতো যাবতীয় যোগ্যতা অর্জন করছে এবং খেলাফতের ঘোষণা না দিলে তার উপর ও পুরা মুসলিম উম্মাহর উপর পাপের আশঙ্কা রয়েছে যা থেকে বাঁচার কোনো ওযর নেই। একারণে দাওলাতে ইসলামের আহলে হাল ওয়াল আকদ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং মাজলিসে শুরা একমত হয়ে,**ইসলামী খিলাফত কায়েম করার ঘোষণা দিচ্ছে**।তারা মুসলিম উম্মাহর জন্য একজন খলীফা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এ উদ্দেশ্য তারা বায়াত হচ্ছে রসুলের বংশধর শায়েখ আব্দুল্লাহ ইব্রাহীম ইবনে আওয়াদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ এর নিকট। যিনি বংশের দিক থেকে আল-বাদরী আল কোরেশী আলহাশেমী আল-হুসাইনী জন্মস্থানের দিক থেকে সমাররায়ী এবং ইলম অর্জন ও অবস্থানের দিক থেকে বাগদাদী [সংক্ষেপে আবু বকর আল-বাগদাদী]।

এরপর তিনি বলেন,

وعليه: يُلغى اسم "العراق والشام" مِن مسمّى الدولة في التداولات والمعاملات الرسمية، ويُقتصر على اسم "الدولة الإسلامية" ابتداء مِن صدور هذا البيان

অতএব, এই ঘোষণার পর থেকে দাওলাতে ইসলামের প্রশাসনিক কার্যক্রমমে ইরাক ও শাম শব্দগুলো বাদ দিয়ে আজ থেকে কেবল দাওলাতে ইসলাম বলা হবে।

এরপর তিনি বলেন,

وننبّه المسلمين: أنه بإعلان الخلافة؛ صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه الله، وتبطل شرعيّة جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده

আমরা মুসলিমদের সতর্ক করে দিয়ে বলছি এই খেলাফত ঘোষণার মাধ্যমে সমস্ত মুসলিমদের উপর ফরজ হলো খলীফা ইব্রাহীম হাফিজাহুল্লাহ এর নিকট বায়াত হওয়া এবং তাকে নুসরত করা। যেখানে খলীফার কর্তৃত্ব ও তার সৈন্যরা রয়েছে সেখানে মুসলিমদের অন্য সকল সংগঠন বা ইমারত বা নেতৃত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে বাতিল

প্রমাণিত হয়।

এরপর তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে একটি কথা উল্লেখ করেন,

ومَن غلب عليهم بالسيف؛ حتى صار خليفة، وسُمّي أمير المؤمنين: فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إمامًا، برًّا كان أو فاجرًا

যদি কেউ জোর করেও ক্ষমতা দখল করে এমনকি সে খলীফা হয়ে যায় এবং তাকে আমীরুল মু'মিনীন নাম দেওয়া হয় তবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এমন কারও পক্ষে এক রাতের জন্যও তার নিকট বায়াত না হয়ে অপেক্ষা করা বৈধ নয়। সে নেককার লোক হোক বা পাপী লোক হোক।

এরপর তিনি বলেন, আর খলীফা ইব্রাহীম আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন তার মধ্যে খলীফা হওয়ার সকল শর্ত পূরণ হয়েছে আর পূর্বে আবু উমর আল বাগদাদীর পর ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার নিকট বায়াত হয়েছিল। ইরাক ও শামের বিস্তীর্ণ এলাকাতে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ ইরাকের দিয়ালা হতে শামের হালাব পর্যন্ত এলাকা তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অতএব, ওহে আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে ভয় করো। তোমাদের খলীফার নির্দেশ শোনো ও মানো আর তোমাদের দাওলাতকে নুসরত করো। যে দাওলাত দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং তার শত্রুরা দিনের পর দিন দূর্বল হয়ে পড়ছে।

এরপর তিনি বলেন,

فهلموا أيها المسلمون!؛ التفّوا حول خليفتكم؛ لتعودوا كما كنتم أبد الدهر؛ ملوك الأرض، فرسان الحرب، هلموا لتعيشوا أعزة كرماء، سادة شرفاء، واعلموا أننا نقاتل عن دين وعد الله بنصره، وأمة جعل الله لها العزة والرفعة والسيادة، ووعدها بالاستخلاف والتمكين، هلموا أيها المسلمون إلى عزكم، إلى نصركم؛ فو الله لئن تكفروا بالديمقراطية والعَلمانية والقومية، وغيرها مِن زبالات الغرب وأفكاره، وتعودوا لدينكم وعقيدتكم؛ فو الله وتالله: لَتملكنّ الأرض، ولَيخضعنّ لكم الشرق والغرب، هذا وعد الله لكم، هذا وعد الله لكم

হে মুসলিমরা তোমাদের খলীফাকে ঘিরে একত্রিত হও যাতে তোমরা পূর্বের যমানার মতো পৃথিবীর কর্তৃত্ব হাসিল করতে পারো। মনে রেখো আমরা এমন একটা দ্বীনের জন্য লড়াই করছি স্বয়ং আল্লাহ যা বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। যার অনুসারীদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও সম্মান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। যদি তোমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরোপেক্ষতা, দেশত্ববোধ এবং অন্যান্য পশ্চিমা ধ্যান-ধারনাকে পরিত্যাগ করে তোমাদের দ্বীনের সঠিক আক্বীদায় ফিরে আসো তবে আল্লাহর কসম তোমরা পুরা

পৃথিবীর মালিক হয়ে যাবে। আর পূর্ব-পশ্চিমের সকল লোক তোমাদের অধিনস্ত হবে। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা।

এরপর তিনি ইসলামের নামে পৃথিবীর বুকে যত দল বা সংগঠন আছে তাদের সকলপ্রকার বিভক্তি পরিত্যাগ করে খলীফার অধীনে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান করেন। তিনি বলেন,যদি তোমরা খেলাফতের পক্ষে থাকো তবে এতে তোমাদেরই লাভ। যেহেতু এটা তোমাদের খেলাফত আর যদি তোমরা এর বিপক্ষে থাকো তবে খেলাফতের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [উল্টো নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলনে,

إن هذا الأمر في قريش؛ لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه، ما أقاموا الدين

খেলাফতের বিষয়টি কুরাইশ বংশের মধ্যেই থাকবে তাদের সাথে যে কেউ এ বিষয়ে বিরোধ করবে আল্লাহ তাকে মুখ থুবড়ে ফেলে দেবেন। যতদিন তারা আল্লাহর দ্বীন কায়েম করে। [সহীহ বুখারী]

এরপর তিনি অন্য সকল সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكين وقيام الخلافة: بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بالله :أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة

অন্য সকল দল ও সংগঠনের সদস্যদের বলছি, জেনে রাখো এই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে তোমাদের দল ও সংগঠনের বৈধতা শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এমন কারও পক্ষে এখন আর খলীফার আনুগত্যের বাইরে থেকে এক রাতও অতিবাহিত করা বৈধ নয়।

এরপর তিনি খেলাফতের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يا جنود الدولة الإسلامية؛ إن مِن عظيم نعم الله تبارك وتعالى عليكم أن بلّغكم هذا اليوم، وأشهدكم هذا النصر،

ওহে দাওলাতে ইসলামের সৈন্যরা আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদের আজকের দিনটি দেখার সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি আজকের এই বিজয়ে তোমাদের সাক্ষী রেখেছেন।

এরপর তিনি তাদের এই গুরুদায়িত্ব বহন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে আহ্বান করেন।

এরপর তিনি বিরোধী পক্ষের বেশ কিছু সংশয়ের উত্তর দেন যা আমরা পরবর্তীতে ঐ সকল সংশয় সম্পর্কে আলোচনার সময় উল্লেখ করবো।

এর কয়েকদিন পর রমজান মাসের প্রথম জুময়াতে মুসলিম জাহানের খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদী মুসলের বড় মসজিদে জনসম্মুখে বক্তব্য দেন। উক্ত বক্তব্যে তিনি প্রথমে রমজান মাসের ফজিলত বর্ণনা করেন এবং মুসলিমদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেন তারপর বলেন,

وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالي عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا الي اعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب علي المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بغضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وهاهم قد أقاموه ولله الحمد والمنة

আপনাদের মুজাহিদ ভায়েরা বহু বছর ধরে ধৈর্যের সাথে জিহাদে লিপ্ত ছিল এবং শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা এখন পৃথিবীতে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের খেলাফত কয়েম করে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছেন। তাই তারা কালবিলম্ব না করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এবং একজন খলীফা মনোনিত করার ঘোষণা দিয়েছে। এটা মুসলমানদের উপর একটা ফরজ দায়িত্ব। এমন একটা ফরজ দায়িত্ব যা কয়েক শতাব্দি ধরে পরিত্যাক্ত রয়েছে এবং বাস্তব ময়দানে অনুপস্থিত রয়েছে। ফলে বহু সংখ্যক মুসলিম এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। এটা পরিত্যাগ করার কারণে মুসলিমরা অপরাধী হচ্ছিল। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল এটা কায়েম করার জন্য সর্বদা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার। আর আজ তারা এটা কায়েম করেছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

এরপর তিনি প্রথম খলীফা আবু বকর ﵁ খলীফা হওয়ার পর প্রথম বক্তব্যে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো পুনারাবৃত্তি করেন, তিনি বলেন,

ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد أبتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني علي حق فأعينوني وإن رأيتموني علي باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم

আমার উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। যদি আমাকে হকের উপর চলতে দেখেন তবে আমাকে সাহযোগিতা করবেন আর যদি আমাকে বাতিলের উপর চলতে দেখেন তবে নসিহত করবেন এবং সংশোধন

করবেন। আমি যতদিন আল্লাহর আনুগত্য করি ততদিন আপনারা আমার আনুগত্য করবেন আর যদি আমি আল্লাহর অবাধ্য হই তবে আপনাদের উপর আমার আনুগত্য করা আবশ্যক নয়।

এরপর তিনি বলেন,

وإني لا أعدكم كم ايعد الملوك والحكام أتباعهم ورعيتهم من رفاهية ودعة وأمن ورخاء وأنما أعدكم بما وعد الله تبارك وتعالي عباده المؤمنين

দুনিয়ার রাজা-বাদশারা যেভাবে তাদের প্রজাদের শান্তি, নিরাপত্তা, বিলাসিতা, সচ্ছলতা ইত্যদি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় আমি আপনাদের এসব বিষয়ের পতিশ্রুতি দেব না। বরং আমি আপনাদের ঐ প্রতিশ্রুতি দেবো যা স্বয়ং আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদের দিয়েছেন।

এরপর তিনি সূরা নূরের ঐ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন যেখানে ঈমান আনলে এবং সৎ কাজ করলে মুসলিমদের হাতে পৃথিবীর কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হবে এমন ওয়াদা করা হয়েছে।

এই বক্তব্যটির আগে খলীফা মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে আরেকটি বার্তা প্রেরণ করেন সেখানে বলেন,

الدولة دولة المسلمين، والأرض أرض المسلمين، كل المسلمين.
فيا أيها المسلمون في كل مكان؛ مَن استطاع الهجرة إلى الدولة الإسلامية فليهاجر؛ فإن الهجرة إلى دار الإسلام واجبة

এ দেশ মুসলিমদের দেশ এ ভূমি মুসলিমদের ভূমি। সকল মুসলিমদের। অতএব, ওহে সারা বিশ্বের মুসলিমরা, তোমাদের মধ্যে যে কেউ দাওলাতে ইসলামে হিজরত করতে সক্ষম সে হিজরত করুক। কেননা দারুল ইসলামে হিজরত করা ফরজ।

এরপর তিনি আলেম, তালেবে এলম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকদের নাম উল্লেখ করে তাদের দাওলাতে ইসলামে হিজরত করতে আহ্বান করেন।

খেলাফত ঘোষণার পরবর্তী অবস্থা

এই খেলাফতের ঘোষণায় কাফিররা হকচকিয়ে যায়। তারা অপেক্ষা করতে থাকে মুসলিমরা এই খেলাফতকে কিভাবে গ্রহণ করে। তারা কি সত্যি সত্যিই এই

খেলাফতের অধীনে একতাবদ্ধ হবে নাকি নানা অজুহাতে এই খেলাফতকে পরিত্যাগ করে পূর্বের মতো বিভক্ত থেকে যাবে। সন্দেহ নেই যে, মুসলিম উম্মাহ দ্বিতীয় পদক্ষেপটি গ্রহণ করলেই কাফিরদের জন্য অধিক কল্যাণকর।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ এই খিলাফতের সাথে কি আচরণ করলো? এ যাবত কাল যারা তাগুতের হাতে বায়াত হয়ে ছিল, যারা গণতন্ত্রের পচা ডোবায় নাকানি-চুবানি খাচ্ছিল, যারা দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের দূর্গন্ধময় জাহেলীয়াতে পড়ে ছিল তারা খেলাফতের সাথে কি আচরণই বা করতে পারে! স্বাভাবিক ভাবেই এসব চিন্তাধারার লোকেরা খেলাফতকে সরাসরি অস্বীকার করলো। সৌদি আরবের তাগুতী শাসকের গোলাম মুফতি মুহাদ্দিসরা, মিসরের গণতন্ত্রপন্থী ইখওয়ানুল মুসলিনীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নামধারী ইসলামী গবেষকরা এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের ওলামা-মাশায়েখরা একযোগে এই খেলাফতকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করলো। এতে অবশ্য আমরা মোটেও অবাক হয়নি। যে খেলাফত সকল তাগুতী শক্তিকে ধ্বংস করে এবং তাগুতী আইন ও সীমানাকে ভেঙে দিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চায় তাগুতের হাতে পোষা ওলামা-মাশায়েখরা সে খেলাফতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে এতে অবাক হওয়ার কি আছে? যারা আজন্ম জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে খেলাফতের মর্যাদা তাদের বোঝার কথা নয়। তারা নিজেদের যত বড় আলেমই মনে করুক তাদের মতামতের কোনো গুরুত্ব সত্যপন্থী মুজাহিদদের নিকট নেই।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, যারা মুখে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলে এবং এ জন্য জিহাদ ও সংগ্রাম করার দিকে আহ্বান করে এমন একদল মুজাহিদ উপরোক্ত জাহেল লোকদের সাথে তাল মিলিয়ে খেলাফতকে অস্বীকার করে এবং নানা রকম যুক্তি-তর্ক ও অজুহাত দিয়ে খেলাফত থেকে দূরে থাকে এবং খলীফাকে অবমাননা করে। কেবল এতেই শেষ নয় খেলাফতের সৈন্যদের খারেজী হিসেবে আখ্যায়িত করে উল্টো খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। অথচ পূর্বে তারাই খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিতো। তাদের অবস্থা হয়েছে অনেকটা ইয়াহুদীদের মতো। তাদের কিতাবে লেখা ছিল শেষ যামানায় একজন নবী আসবে। উক্ত নবীর বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলীও সেখানে লেখা ছিল। তারা আশা করতো নবী তাদের বংশেই আসবে তাই সকলের নিকট গর্ব করে এসব কথা বলে বেড়াতো কিন্তু দেখা গেলো নবী আসলেন মক্কার নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে। এই নবীই যে তাওরাতে উল্লেখিত নবী সেটা তারা সুস্পষ্টভাবে

বুঝতে পারলো কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে নবী আসে নি তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা এই নবীকে অস্বীকার করলো এবং তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এসব কারণে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٨٩]

এরপূর্বে তারা এ ঘটনা (নবী আসা বা কিতাব নাযিল হওয়া) মানুষকে বলে বেড়াতো। কিন্তু যখনই তিনি আসলেন আর তারা তাকে চিনতেও পারলো তখনই তারা তাকে অস্বীকার করলো। [বাকারা/৮৯]

খেলাফতকে অস্বীকার করার জন্য এসব লোকেরা নানা রকম যুক্তি তর্ক পেশ করতে থাকলো। এরা একেক সময় একেক কথা বলে। কখনও বলে, খলীফা হতে হলে সারা পৃথিবীর লোকের পরামর্শ লাগবে। কখনও বলে, আমাদের পূর্বের একজন খলীফা রয়েছেন তিনি হলেন মোল্লাহ ওমর। তিনি বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় কোনো খলীফার হাতে বায়াত হওয়া বৈধ নয়। অথচ তারাই পূর্বে বলেছে যে, মোল্লা উমর সারা বিশ্বের খলীফা নয় বরং কেবল আফগানস্থানের আমীর। তাছাড়া পরে প্রমাণিত হলো বর্তমান খলীফার হাতে বায়াত হওয়ার আগেই মোল্লা উমর মারা গিয়েছেন। কখনও বলে, খলীফা এবং তার সৈন্যরা খারেজী অথচ কয়েকদিন পূর্বেও তারাই তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছে।

এখন আমরা দেখবো তাদের এই সকল যুক্তিপ্রমাণের সত্যতা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এসবের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু।

খেলাফতের বায়াতের জন্য কি সকলের নিকট পরামর্শ করা শর্ত?

খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি যে যুক্তিটি ব্যবহার করা হয় তা হলো,

— এই বায়াতে মুসলিমদের পরামর্শ নেওয়া হয় নি, অতএব মুসলিমদের উপর এটা মেনে চলা আবশ্যক নয়।

খেলাফত ঘোষণার পর আইমান আজ-জাওয়াহেরী আর-রবি আল-ইসলামী (الربيع الإسلامي) তথা ইসলামী বসন্ত শিরোনামে ধারাবাহিক বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন। ঐ

সকল বক্তব্যের প্রায় প্রতি পর্বে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করে আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফতকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা করেন। তার মধ্যে সর্বাধিক বেশি গুরুত্ব সহকারে যে যুক্তিটি তিনি বারবার পেশ করেন তা হলো,

— এ খেলাফত মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়াই ঘোষণা করা হয়েছে তাই এটা অগ্রহণযোগ্য।

উক্ত ধারাবাহিক বক্তব্যের পঞ্চম পর্বে আয়মান আজ-জাওয়াহেরী খেলাফতের শর্তসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন,

لو وافقكم جمهورُ المسلمين على ذلك، لكان لكم الحقُ. فأما وهم لم يوافقوكم، فما كان لكم أن تستبدوا بأمرِ المسلمين دون مشورتهم

যদি বেশিরভাগ মুসলিম এ বিষয়ে তোমাদের সাথে একমত হতো তবে তোমরা এর অধিকারী হতে কিন্তু যখন তারা একমত হয়নি তখন মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া এ বিষয়টি জবর দখল করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই।

উক্ত বক্তব্যে তিনি আরও বলেন,

لا يمكنُ إقامةُ خلافةٍ تتخطى مشورتَها الإمارةَ الإسلاميةَ في أفغانستانَ باعتبارِها أكبرَ وأقدمَ إمارةٍ شرعيةٍ موجودةٍ للمسلمين، وكذلك لا يمكنُ تخطي مشورةِ إمارةِ القوقازِ، ولا الجماعاتِ المجاهدةِ الثابتةِ على ثغورِ الجهادِ

আফগানস্থানের ইসলামী ইমারতের পরামর্শ ছাড়া খেলাফত কায়েম হতে পারে না। যেহেতু এটা বর্তমান যুগের মুসলিমদের ইমারত সমূহের মধ্যে সর্বাধিক বড় এবং সর্বাপেক্ষা পুরোনো। একইভাবে কোকাজের ইসলামী ইমারতের মাশওয়ারা ব্যাতিরেকে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একইভাবে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ রত কোনো জিহাদী সংগঠনকে বাদ দিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর মতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা হলে ইসলামের মানদন্ডে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। একারণেই তিনি আবু বকর আল-বাগাদাদীর খেলাফতকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বার বার বলেছেন,

من نصبوه خليفةً دونَ مشورةِ المسلمين

যাকে তারা মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়াই খলীফা হিসেনে মনোনিত করেছে .....

এমন কি উক্ত ধারাবাহিক বক্তব্যের প্রথম পর্বে তিনি বলেন,

إعلانِ أبي بكرٍ البغداديِ نفسَه خليفةً دون مشورةِ المسلمين

আবু বকর আল বাগদাদী মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়াই নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেছে।

এছাড়া বিভিন্ন প্রসঙ্গে খলীফা আবু বকর আল বাগাদীর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন,

نصب نفسَه خليفةً دون مشورتِهم

তিনি তাদের পরামর্শ ছাড়াই নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেছেন ....

বলা বাহুল্য যে এটা একটা সসর্ব মিথ্যা কথা। যেহেতু খলীফা আবু বকর আল-বাগাদাদী নিজে নিজেকে খলীফা নিয়োগ করেন নি বরং ইরাক ও শামের মুজাহিদদের বড় একটি দল তাকে খলীফা হিসেবে মনোনিত করেছেন। আজ-জাওয়াহেরী বলতে পারেন একটি দল মনোনিত করলে খেলাফত হবে না বরং পৃথিবীর সকল মুজাহিদ দলের পরামর্শক্রমে খেলাফত কায়েম করতে হবে। এ মতটি সঠিক কি বেঠিক সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু প্রথমেই আমাদের জানতে হবে আবু বকর আল-বাগদাদী নিজেই নিজেকে খলীফা হিসেবে মনোনিত করেছেন এটা একটি জঘন্ন মিথ্যাচার। আমাদের দেশের রানৈতিক দলের নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে এ ধরণের সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনে মহান রব্বুল আলামীন বলেছেন, কারো সাথে বিবাদ বা বিদ্বেষ থাকলেই তার ব্যাপারে বে-ইনসাফী করো না। আজ-জাওয়াহেরীর মতো প্রবীণ ব্যক্তির এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিৎ ছিল। আবু বকর আল-বাগাদাদী তার পরামর্শ না নিয়েই খেলাফতের ঘোষণা দিয়েছে এতে যদি তিনি আঘাত পেয়ে থাকেন সেটা হয়তো স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে মিথ্যা অপবাদ দেবেন এটা সঠিক হতে পারে না।

যাই হোক এটা আমাদের মূল বিষয় নয়। আমাদের মুল বিষয় হলো, খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য বেশিরভাগ মুসলিমের মতামত নেওয়া জরুরী কিনা এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যেসব জিহাদী সংগঠন আছে তাদের সবার মতামত নেওয়াটা শর্ত কিনা।

মজার ব্যাপার হলো, এই কথাটি গণতন্ত্রের সাথে মিলে যায়। আর মুজাহিদরা গোড়া থেকেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফতকে অস্বীকার করার স্বার্থে বর্তমানে কিছু মুজাহিদ এমন কি কিছু বয়ষ্ক ও অভিজ্ঞ মুজাহিদ গণতন্ত্রের সাথে মিল রেখে কথা বলতে শুরু করেছেন।

মহান আল্লাহ মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করতে বলেছেন এবং পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিম জাহানের খলীফা সাধারন অবস্থায় পরামর্শের মাধ্যমেই নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যারা মনে করে এর অর্থ পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করতে হবে তারা আসলে ভুল বোঝে। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতেও ভুল এবং বুদ্ধির বিচারেও অসম্ভব।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

বানী ইসরাইলকে নবীরা শাসন করতো। যখনই একজন নবী গত হতেন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই তবে খলীফা হবে। অনেক সময় (একই যুগে) একাধিক খলীফা হবে। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, তখন আমাদের কি করার নির্দেশ দেন? রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, প্রথম ব্যক্তির বায়াত পূর্ণ করো। [বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম নাব্বী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْدَ خَلِيفَةٍ فَبَيْعَةُ الْأَوَّلِ صَحِيحَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا وَبَيْعَةُ الثَّانِي بَاطِلَةٌ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ طَلَبُهَا وَسَوَاءٌ عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الأول جَاهِلِينَ وَسَوَاءٌ كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَدٍ

এই হাদীসের অর্থ হলো, যখন একজন খলীফার পর অন্য একজন খলীফার হাতে বায়াত দেওয়া হয় তখন প্রথম ব্যক্তির বায়াত পূর্ণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির বায়াত বাতিল হবে। তার বায়াত পূর্ণ করা হারাম হবে। ঐ ব্যক্তির জন্য বায়াতের দাবী করাও হারাম হবে। যারা দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে বায়াত হয়েছে তারা আগের বায়াত সম্পর্কে জানুক বা না জানুক। দুইজনের বায়াত একই দেশে হোক বা ভিন্ন ভিন্ন দুটি দেশে হোক। [শারহে মুসলিম]

মোট কথা যদি একই দেশে বা দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা পৃথক পৃথক দুজন ব্যক্তির নিকট বায়াত হয় তবে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো প্রথম বায়াত পূর্ণ করতে হবে।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, এখানে একই যুগে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দল দুজন পৃথক খলীফার নিকট বায়াত হচ্ছে এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, প্রথম খলীফার হাতে পুরো

মুসলিম উম্মাহ বায়াত হচ্ছে না। তবু রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার বায়াত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এ কথা সত্য হতো যে, খলীফা হওয়ার জন্য সকল মুসলিমদের মতামত শর্ত। তবে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এখানে প্রথম ব্যক্তির বায়াত পূর্ণ করতে বলতেন না এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির বায়াত বাতিল ঘোষণা করতেন না। বরং সকলের বায়াত বাতিল ঘোষণা করতেন যেহেতু তাদের কারো নিকট পুরো মুসলিম উম্মাহ বায়াত হয় নি। এখানে আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, একইযুগে যখন একাধিক খলীফার হাতে মানুষ বায়াত হয় রসুলুল্লাহ্ ﷺ এমন বলেন নি যে, দেখতে হবে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক কার নিকট বায়াত হয়েছে এবং তার বায়াত পূর্ণ করতে হবে বরং যে কোনো ক্ষেত্রে প্রথম বায়াত পূর্ণ করতে বলেছেন। তাহলে খলীফা হওয়ার জন্য সকলের বা বেশিরভাগের মতামত শর্ত করাটা এই হাদীসের বিরুদ্ধে। একারণে পূর্ববর্তী বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম এধরণের মতকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন।

আল-মাওরুদী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ؛ لِيَكُونَ الرِّضَاءُ بِهِ عَامًّا وَالتَّسْلِيمُ لِإِمَامَتِهِ إجْمَاعًا، وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى الْخِلَافَةِ بِاخْتِيَارِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِبَيْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا

কতজন লোকের বায়াতের মাধ্যমে খলীফা মনোনিত হবে সে ব্যাপারে আলেমরা দ্বিমত করেছেন। একদল বলেছেন, প্রতিটি এলাকার আহলে হাল ওয়াল আকদ (মুসলীমদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি) যারা তাদের মধ্যে বেশিরভাগের সম্মতি ছাড়া হবে না। যাতে খলীফার ব্যাপারে ব্যাপক সমর্থন থাকে এবং সবাই একযোগে তাকে গ্রহণ করে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বায়াতের মাধ্যমে এই মতটি বাতিল প্রমাণিত হয়। যেহেতু উপস্থিত লোকেরাই তার হাতে বায়াত হয়েছিল এবং তিনি (খেলাফতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য) অনুপস্থিত লোকেদের (দূর-দূরান্ত থেকে) বায়াত দিতে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বায়াত দিতে কিছু দিন দেরি করা সম্পর্কে ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَمَعَ هَذَا فَتَأَخُّرُهُ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي الْبَيْعَةِ وَلَا فِيهِ أَمَّا الْبَيْعَةُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَةُ كُلِّ النَّاسِ وَلَا كُلِّ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعِقْدِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ وَأَمَّا عَدَمُ الْقَدْحِ فِيهِ فَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ وَيُبَايِعَهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِذَا عَقَدَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِلْإِمَامِ الِانْقِيَادُ لَهُ وأن لا يظهر خلافا ولا يشق لعصا وَهَكَذَا كَانَ شَأْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ

الَّتِي قَبْلَ بَيْعَتِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُظْهِرْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ خِلَافًا وَلَا شَقَّ الْعَصَا

এ সত্ত্বেও আলী ﵁ এর বায়াত হতে দেরি করাটা আবু বকর ﵁ এর বায়াত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি সৃষ্টি করে না। এর মাধ্যমে আলী ﵁ নিজেও পাপী হন না। তার সমর্থন ছাড়াই বায়াত শুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, উম্মতের ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, বায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সকল মুসলিমদের বায়াত হওয়া শর্ত নয়। এমন কি যারা আহলে হাল ওয়াল আকদ (মুসলিমদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গ) তাদের সকলের বায়াত হওয়াটাও শর্ত নয়। বরং আলেম-ওলামা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জননেতাদের মধ্যে যাদের একত্রিত হওয়া সম্ভব এমন কিছু সংখ্যক লোকের বায়াত হওয়াই শর্ত। আর আলী ﵁ এর কোনো পাপ না হওয়ার কারণ হলো, সকলের জন্য খলীফার হাতে হাত দিয়ে বায়াত হওয়া শর্ত নয়। বরং ফরজ হলো যখন আহলে হাল ওয়াল আকদ (উপরোক্ত পন্থায়) কারো হাতে বায়াত হয় তখন সেটা মেনে নেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধচারণ না করা। আলী ﵁ যে সময়টুকু বায়াত থেকে দূরে ছিলেন সে সময় তার অবস্থা এমনই ছিল। যেহেতু তিনি আবু বকর ﵁ এর ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন নি এবং মুসলিমদের একতা ভঙ্গ করেন নি।[শারহে মুসলিম]

ইবনে হিযাম তার মিলাল ওয়ান নিহাল নামক গ্রন্থে বলেন,

أما من قَالَ أَن الْإِمَامَة لَا تصح إِلَّا بِعقد فضلاء الْأمة فِي أقطار الْبِلَاد فَباطِل لِأَنَّهُ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَمَا لَيْسَ فِي الوسع وَمَا هُوَ أعظم الْحَرج وَالله تَعَالَى لَا يُكَلف نفسا وَقَالَ تَعَالَى {وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج}

যে বলে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের উৎকৃষ্ট লোকেদের বায়াত ছাড়া ইমামত (খেলাফত) গ্রহণযোগ্য হবে না তার এ কথা বাতিল। কেননা এটা এমন একটা দায়িত্ব যা পালন করা সম্ভব নয়। এটা আদায় করতে কেউ সক্ষম নই এবং (সক্ষম হলেও) এটা প্রচন্ড কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর আল্লাহ বলেন, "তোমাদের দ্বীনে অত্যধিক কষ্টকর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। [হাজ্জ-৭৮]

এরপর তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার নাম উল্লেখ করে বলেন, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান এবং সেখান থেকে দূর-দূরান্তের লোকের বায়াত সংগ্রহের মতো কষ্টকর কাজ আর কি আছে! তারপর বলেন,

وَلَا بُد من ضيَاع أُمُور الْمُسلمين قبل أَن يجمع جُزْء من مائَة جُزْء من فضلاء أهل هَذِه الْبِلَاد فَبَطل هَذَا القَوْل الْفَاسِد مَعَ أَنه لَو كَانَ مُمكنا لما لزم لِأَنَّهُ دَعْوَى بِلَا برهَان وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى {وتعاونوا على الْبر وَالتَّقوى}

এসব এলাকার সকল উৎকৃষ্ট লোকদের একশ ভাগের এক ভাগ বায়াত সংগ্রহ করার আগেই মুসলমানদের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (যেগুলো খলীফার মাধ্যমে আদায় করতে হয়) ধ্বংস হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে এই ভ্রান্ত কথাটি বাতিল প্রমাণিত হয়। আর যদি এমন সম্ভবও হতো (সকলের মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হতো) তবু তা করা আবশ্যক হতো না যেহেতু এটা প্রমাণহীন দাবী। আর আল্লাহ বলেন, "তোমরা ভাল কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো"। [মায়েদা-২]

অর্থাৎ যখন একদল মুসলিম ভাই কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নিয়োগ করে তখন তাদের সহযোগিতা করো যেহেতু এটা ভাল কাজ। সকলের পরামর্শ নেওয়া হয়নি, মুসলিমদের হক নষ্ট করা হয়েছে ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলো না।

দেখা যাচ্ছে খেলাফতের বায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সকলের মতামত বা বেশিরভাগের মতামত লাগবে এটা কুরআন-হাদীস ও বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত নয়। এটা আসলে গণতন্ত্রের মূলনীতি। পূর্বে আমরা দেখতাম কেবল গণতন্ত্রের ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই এ ধরণের কথা বলে বেড়াতো কিন্তু বর্তমানে দেখছি প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বশত কিছু মুজাহিদ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ তাদের আশু আরোগ্য দান করুন।

যারা বেশিরভাগ লোকের মতামত ছাড়া খলীফা মনোনিত করা বৈধ নয় এমন মনে করে তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশ্বের সকল মুসলিমদের নিকট মতামত তথা ভোট সংগ্রহ না করা পর্যন্ত বেশিরভাগের মত কার পক্ষে সেটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ভোট গ্রহণের আগে যে কেউ দাবী করতে পারে আমার পক্ষেই বেশিরভাগের মতামত রয়েছে। এমনকি বর্তমানে বাশার আসাদের বিরুদ্ধে সিরায়াবাসী ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করার পরও সে দাবী করছে সিরিয়ার জনগন যদি আমাকে না চায় আমি তৎক্ষনাৎ ক্ষমতা ছেড়ে দেবো। অর্থাৎ তার দাবী সিরিয়ার বেশিরভাগ জনগন এখনও তাকে চায়। অথচ বিদ্রোহীরা দাবী করছে সিরিয়ার বেশিরভাগ জনগন বাশার আসাদকে চায় না। একইভাবে আল-কায়েদার লোকেরা দাবী করছে মুজাহিদদের মধ্যে বেশিরভাগের মতামত গ্রহণ না করেই আবু বকর আল-বাগদাদীকে খেলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে দাওলাতে ইসলামের দাবী বিশ্বের মুজাহিদদের বেশিরভাগ আবু বকর আল বাগদাদীর হাতে বায়াত হয়েছেন। এখন কাদের কথা সঠিক এটা জানার উপায় কি? সবার ভোট সংগ্রহ করার ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় আছে কি? তবে কি

আল-কায়েদার লোকেরা খলীফা মনোনিত করার জন্য ভোটা-ভুটি করার পরামর্শ দেবেন?

দেখা যাচ্ছে, যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুজাহিদরা আজীবন লড়াই করে এসেছেন আজ হিংসার বশবর্তী হয়ে সেই গণতন্ত্রের মূলনীতি আওড়াতে শুরু করেছেন। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপারই বটে।

তার চেয়েও হাস্যকর ব্যাপার হলো, আয়মান আজ-জাওয়াহেরী বারবার ওয়াদা করছেন মুসলিমদের পরামর্শে নতুন একটা খেলাফত কায়েম করার জন্য। এই মহান দায়িত্ব পালন করার স্বার্থে তিনি তালেবানদের নতুন আমীর মোল্লা আখতার মানছুরের হাতে বায়াত হয়েছেন। মোল্লাহ ওমরের মৃত্যুর খবর ফাস হওয়ার পর ১৩ আগস্ট ২০১৫ ইং তারিখে তালেবানদের নতুন আমীর মোল্লাহ আখতার মানছুরকে বায়াত দিয়ে তিনি বলেন,

ونبايعكم علي إقامة الخلافة الإسلامية التي تقوم علي أختيار المسلمين ورضاهم وتنشر العدل وتبسط الشوري .....

আমরা আপনার হাতে বায়াত হচ্ছি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা মুসলমানদের মতামত ও সমর্থনে কায়েম করা হবে। সেখানে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং পরামর্শের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

এখানে দুটি হাস্যকর ব্যাপার রয়েছে। প্রথমত: তিনি মুসলিমদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন একটি খেলাফত কায়েমের কথা বলেছেন। প্রশ্ন হলো, এই নতুন খেলাফতে ইরাক ও শামের এবং বিশ্বের অন্যান্য এলাকার যেসব মুসলিম আবু-বকর আল-বাগাদাদীর হাতে বায়াত হয়েছেন তাদের মতামত নেওয়া হবে নাকি তাদের বাদ দিয়ে নতুন খেলাফত কায়েম করা হবে?

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্র এটা স্পষ্টভাবে জানে যে, বর্তমান খলীফার অনুসারীরা তাকেই নবুয়তের আদলে সঠিক খলীফা মনে করে। অতএব সেটা পরিত্যাগ করে নতুন কোনো খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার ডাকে তারা কস্মিনকালেও সাড়া দেবে না। যদি তাদের মতামত ছাড়া খেলাফত কায়েম না করা হয় তবে এ জীবনে আজ-জাওয়াহেরীর ভাগ্যে কোনো খেলাফত প্রতিষ্টা করাই সম্ভব হবে না। আর যদি তিনি বলেন, বর্তমান খলীফার অনুসারীদের বাদ দিয়েই নতুন খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা হবে তাহলে প্রশ্ন হলো, সেটা কি মুসলিমদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত বলে গণ্য হবে? যদি আপনাদের পরামর্শ না নেওয়ার কারণে বর্তমান খেলাফত অগ্রহণযোগ্য হয়

তবে তাদের পরামর্শ না নেওয়ার কারণে আপনাদের খেলাফত কি অগ্রহণযোগ্য হবে না? নাকি তখন মুসলিম জাহানে দুটি খেলাফত থাকবে? মুসলিম উম্মাহকে এভাবে বিভক্ত করে ফেলা জাহেলিয়াত নয় কি?

দ্বিতীয় হাস্যকর বিষয়টি হলো, খেলাফত কায়েম করার জন্য তিনি তালেবানদের নতুন আমীর মোল্লা আখতার মানছুরের হাতে বায়াত হয়েছেন। মানছুরের হাতে বায়াত হওয়ার সময় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন খেলাফত কায়েম করার শর্তে আমরা আপনার নিকট বায়াত হচ্ছি। উক্ত বক্তব্যে তিনি আরও বলেন,

ونبايعكم علي جهاد الحكام المبدلين للشرائع الذين تسلطوا علي ديار المسلمين وعطلوا أحكام الشريعة وفرضوا علي المسلمين أحكام الكفار ....

আমরা আপনার নিকট বায়াত হচ্ছি ঐসকল শাসকদের সাথে জিহাদ করার জন্য যারা শরীয়তের বিধানকে পরিবর্তন করেছে এবং মুসলীম দেশসমূহের উপর জেকে বসে সেখানে শরীয়তের বিধান বাতিল করে কাফিরদের বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে ....

এভাবে মুসলিম বিশ্বের তাগুতী শক্তি এবং বিশ্বের কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে বিশ্বব্যাপী খেলাফত কায়েম করার জন্য তিনি মানছুরের হাতে বায়াত হয়েছেন। অথচ পূর্বে মোল্লাহ মানছুর প্রতি ঈদে মোল্লা উমরের নামে যেসব পত্র প্রকাশ করেছেন এবং তালেবানদের পক্ষ থেকে যেসব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আমরা কেবল আফগানস্থানকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করছি। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমরা সদা-সর্বদা সুস্পর্ক বজায় রাখবো ইত্যাদি।

১৪৩৫ হিজরী ঈদুল ফিতর তথা ২০১৪ সালের জুলাই মাসে মোল্লাহ ওমরের নামে প্রকাশিত বক্তব্যে বলা হয়েছে,

إنّنا نطمئن دول العالم والجوار مرّة أخرى أنّ كفاحنا هو لتحرير البلد و إقامة نظام إسلامي مستقل فيه، وكما أنّنا لانريد الإضرار و التدخل في شؤون دول الجوار والمنطقة والعالم، كذلك لانتحمّل الموقف العدائي الضارّ من أحد، ونطالب الآخرين أيضا باتخاذ الموقف المماثل تجاهنا. وإنّني آمر المجاهدين المرابطين في الحدود والثغور أن يحرسوا حدود البلد، وأن يحافظوا على العلاقات الحسنة على أساس من الاحترام المتقابل

আমরা বিশ্বকে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে চিন্তামুক্ত করার জন্য আরও একবার জানাচ্ছি যে, আমাদের সংগ্রাম কেবল এ দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং এখানে একটি স্বাধীন ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যেমন আমরা আমাদের

আশেপাশের, এ অঞ্চলের এবং বিশ্বের অন্য কোনো দেশের নিজস্ব বিষয়ে নাক গলাতে চায় না তেমনি অন্য কারও পক্ষ থেকে শত্রুতামূলক আচরণ আমরা সহ্য করবো না। আমরা সকলকে অনুরোধ করবো আমাদের মতো আচরণ করার জন্য। আমি সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত মুজাহিদদের নির্দেশ দিচ্ছি তারা যেনো দেশের সীমান্ত রক্ষা করে চলে এবং (অন্য দেশের সাথে) পারস্পারিক সুসসম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

[তালেবানদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত আস-সমুদ পত্রিকা- ১০০ নং সংখ্যা]

উল্লেখ্য যে, এই পত্র ২০১৪ সালে জুলাই মাসে মোল্লা উমরের নামে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে ফাঁস হয়ে গেছে যে মোল্লা ওমর ২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল মারা গেছেন। অনেক গড়িমসির পর তালেবানরা নিজেরাই ৩০ আগস্ট ২০১৫ ইং তারিখে এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেছে যে, মোল্লা উমর আড়াই বছর আগেই মারা গেছেন কিন্তু তা গোপন রাখা হয় [উক্ত পত্রিকা-১১৪ নং সখ্যা]

অর্থাৎ এতদিন এ খবর গোপন রেখে তার নাম ব্যবহার করে মোল্লা মানছুর তালেবানদের পরিচালনা করেছে। এমনকি মোল্লা মানছুর মোল্লা উমরের নামে বিভিন্ন বার্তাও প্রকাশ করেছে। এই পত্রটিও সেসব জাল পত্রের মধ্যে একটি। এটা মূলত মানছুরের পক্ষ থেকে। মোল্লা ওমর এ থেকে দায় মুক্ত।

এসব খবর ফাস হওয়ার পর এবং পরামর্শের নাটক করে প্রকাশ্যে আমীরুল মুমিনীনের পদ গ্রহণ করার পর জিল-হাজ্জ ১৪৩৬ মোতাবেক অক্টবর ২০১৫ ইং তারিখে ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে দেওয়া বক্তব্যে আল-মানছুর নিজেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেন,

وقد أبلغ المكتب السياسي رسالة الإمارة الإسلامية الي الجميع بأننا نريد إقامة العلاقات الحسنة مع دول الجوار والدول في المنطقة والعالم وبالأخص مع الدول الإسلامية

আমাদের তথ্যকেন্দ্র ইমরাতে ইসলামিয়ার এই বার্তা সবার নিকট পৌঁছে দিয়েছে যে, আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, এই অঞ্চলের (উপমহাদেশের) রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে, বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাই। [মাসিক 'আস-সমুদ' এর ১১৪ নং সংখ্যা]

লক্ষ্যণীয় হলো, মনছুরের এই বক্তব্যটি আজ-জাওয়াহেরী প্রকাশ্যে তার হাতে বায়াত ঘোষনার দুই মাস পর প্রকাশিত হয়েছে। আজ-জাওয়াহেরী বলেছেন, বিশ্বের সকল কাফির মুশরিক ও তাগুতী শক্তির সাথে সংগ্রাম করে বিশ্বব্যাপী ইসলাম কায়েম

করার শর্তে আমরা আপনার হাতে বায়াত হচ্ছি। কিন্তু মনছুর ঘোষণা করেছেন, আশেপাশের দেশগুলো তো বটেই সেই সাথে সারা বিশ্বে যত রাষ্ট্র আছে এবং বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সাথে তারা সুসম্পর্ক স্থাপণ করবেন। অর্থাৎ কাফির রাষ্ট্র বা নামধারী মুসলিম রাষ্ট্র কারও সাথে তিনি বিরোধে জড়াবেন না।

আজ-জাওয়াহেরী বললেন, কাফির ও তাগুতী রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষের কথা আর তার আমীর বললেন, সুস্পম্পর্কের কথা। বিষয়টা কারও মুখে কষে একটা চড় মারার চেয়েও বেশি অপমানজনক নয় কি? কিন্তু আজ-জাওয়াহেরী এ অপমান মুখ বুজে সহ্য করেছেন কারণ যে কোনো মূল্যে তাকে ইসলামী খেলাফতের সাথে শত্রুতা করতে হবে। এটা তার কঠিন দায়িত্ব।

প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি অন্যান্য কাফির এবং তাগুতী রাষ্ট্রসমূহের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার ঘোষণা দেয় সে কিভাবে ঐ সকল রাষ্ট্রের তাগুতী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বিশ্বব্যাপী খেলাফতই বা সে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবে?

অনেকে বলতে পারেন, এখানে মোল্লা সাহেব আসলে তাওরিয়া করেছেন। প্রকাশ্যে বাইরের রাষ্ট্রগুলোর সাথে সদ্ভাব রাখার কথা বলেছেন কিন্তু গোপনে ঠিকই জাওয়াহেরীর সাথে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ওয়াদা করেছেন। তাই তো আজ-জাওয়াহেরী তাকে বায়াত দিয়েছে।

এ যুক্তিটা অবশ্য মন্দ নয়। এনারা আবার তাওরিয়াতে উস্তাদ। তাওরিয়ার উপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের মৃত আমীরকে আড়াই বছর জীবিত রেখেছেন। এটা কি কম বড় কারামত। অতএব বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রাখবো, যুদ্ধ করবো না এ কথাটাও তাওরিয়া হতে পারে। হয়তো তিনি প্রকাশ্যে এ কথা বলছেন কিন্তু গোপনে আজ-জাওয়াহেরীর কাছে ঠিকই ওয়াদা করে রেখেছেন সারা বিশ্বের সাথে যুদ্ধ করে খেলাফত কায়েম করার। এটা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, তিনি আজ-জাওয়াহেরীর সাথে গোপনে যে ওয়াদা করেছেন সেটাই আসলে তাওরিয়া! এটা কিন্তু আগের চেয়ে বেশি সম্ভব। মানুষ প্রকাশ্যে যে ঘোষণা দেয় সেটা পরিবর্তন করা বেশি কঠিন। আর গোপনে যে ওয়াদা করে সেটা অস্বীকার করা সহজ। এটাই বেশি সম্ভব যে, আখতার মানছুর গোপনে সারা বিশ্বের সাথে যুদ্ধ করার ওয়াদা করে আজ-জাওয়াহেরীকে বোকা বানিয়ে বায়াতটা হাতিয়ে নিয়েছেন। যে লোক সারা বিশ্বের মানুষের সাথে প্রতারোনা করতে পারে তার কাছে একজন বৃদ্ধ মানুষকে বোকা বানানো কঠিন কিছু নয়।

আসল কথা কিন্তু এসবের বিপরীত। আখতার মানসুর যে আফগান ছাড়া সারা বিশ্বের

কোনো খোঁজ-খবার রাখেন না সেটা আজ-জাওয়াহেরী বিলক্ষণ জানেন। খলীফার প্রতি হিংসা আর বিদ্বেষ তাকে মানছুরের হাতে বায়াত হতে বাধ্য করেছে। এভাবে তিনি নব্য প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। এতে অবশ্য খেলাফতের কোনো ক্ষতি হয়নি বরং বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি নিজেই হেয় হয়েছেন। এই বায়াতের মাধ্যমে মৃত মানুষের নামে মিথ্যাচার করার মতো ঘৃণ্য কাজে তিনি মানছুরের সহযোগী হয়েছেন।

মজার ব্যাপার হলো, তিনি আবু বকর আল-বাগদাদীর বায়াতকে মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এবং তিনি নিজেই নিজেকে খলীফা হিসেবে নিয়োগ করেছেন বলে তামাশা করেছেন। কিন্তু তিনি যে মানছুরের হাতে বায়াত হয়েছেন এবং তাকে মাওলানা আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্মোধন করে সারা বিশ্বের তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খেলাফত কায়েমের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি কিভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তা সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে। প্রথমে তো মোল্লা ওমরের মৃত্যুর খবর গোপন রেখে তার পদটাই চুরি করে দখল করার চেষ্টা করেছেন। কয়েক বছরের জন্য সফলও হয়েছেন। হয়তো এখনও এভাবেই চলতেন কিন্তু আল্লাহ তাদের মুখোস উম্মোচন করতে চেয়েছেন তাই সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু মিথ্যুক সহজে ধরা পড়তে চায় না। প্রথশে তারা বলে মোল্লাহ উমর সম্প্রতি নিহত হয়েছেন কিন্তু বেশ কিছুদিন পর স্বীকার করে তিনি আসলে আড়াই বছর আগে ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই খবর ফাঁস হয়ে গেলে মোল্লা মানছুর মজলিসে শুরার পরামর্শের নাটক করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তালেবানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকে এই পরামর্শকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে এবং এই নেতৃত্বকে অস্বীকার করে। তাদের কেউ কেউ তার নামে বিভিন্ন আপত্তি অভিযোগও উত্থাপন করেছেন।

এই হলো আজ-জাওয়াহেরীর নতুন আমীরের পরামর্শের হাল হাক্বীকত। নিজের লোকেরাই যার ব্যাপারে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে সেই বিতর্কিত লোকের হাতে বায়াত হতে তার মোটেও লজ্জা করে নি। কে জানে আর কারও পরামর্শ না নিলেও হয়তো মানছুর তার পরামর্শ নিয়েছিল। আর তার পরমর্শ নেওয়ার কারণেই তিনি বেজায় খুশি হয়ে তার পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করেছেন। আর কার পরামর্শ বাদ গেলো সেটা লক্ষ্য করেন নি।

আজ-জাওয়াহেরীর পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল কিনা সেটা আমরা জানি না। তিনিও বলেন নি। খুব সম্ভবত এ ভাগ্য তার কপালে জোটে নি। যেহেতু তালেবানরা নিজেদের ব্যাপারে বাইরের কাউকে নাক গলাতে দেয় না। তাদের মতে

আফগানস্থানের ইসলামী ইমারত কেবল মাত্র আফগানদের জন্য। এখানে বাইরের কাউকে নাক গলাতে দেওয়া হবে না। বাইরের লোকেদের তালেবানদের হাতে বায়াত হওয়ার অধিকার আছে। তালেবানরা কার হাতে বায়াত হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। সেটা একান্তই আফগান জনগণের ব্যাপার। তাদের পক্ষ থেকে এসব কথা বহু বার বলা হয়েছে যার কিছু নমুনা আমরা পূর্বে দেখেছি আরও অনেক আছে তবে সেগুলো এখানে উল্লেখ করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হবে। কিন্তু আখতার মানছুর খোদ আফগানদেরও ফাঁকি দিয়েছেন। তাদের পরামর্শও সঠিকভাবে গ্রহণ করেন নি। তাই তো তার ব্যাপারে খোদ আফগানের লোকেরাই দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েছে।

বিপরীতে আবু বকর আল-বাগদাদীকে নিয়োগ করার সময় দাওলাতে ইসলামের মজলিসে শুরা একমত হয়ে নিয়োগ করেছেন। তার ব্যাপারে দাওলাতে ইসলামের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দ্বিমত করেননি। পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদরা তার নিকট আনুগত্যের শপথ পাঠিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের বেশ কিছু বড় বড় দল তার হাতে আনুগত্যের শপথ পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে মিসরের সাইনায় অবস্থিত "আনসারু বায়তিল মাকদিস" বর্তমানে সাইনা প্রদেশ, লিবিয়াতে বেশ কয়েকটি প্রদেশ, কোকাজের ইসলামী ইমারত বর্তমানে কোকাজ প্রদেশ, নাইজেরিয়ার দুর্ধর্ষ জিহাদী সংগঠন জামায়াতু আহলে সুন্নাহ লিদ-দা'ওয়া ওয়াল জিহাদ সংক্ষেপে বোকো হারাম বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার প্রদেশ নামে এবং পাকিস্থান ও আফগানস্থানে খোদ তালেবানদের মধ্যে থেকে একদল মুজাহিদ বের হয়ে খোরাসানের প্রদেশ নামে খেলাফতের অধীনে কাজ করছে। এছাড়া ইয়ামেন, আল-জেরিয়া, সোমাল, বাংলাদেশ ইত্যাদি এলাকায় কিছু মুজাহিদ বাহিনী খেলাফতের নিকট বায়াত দিয়ে জিহাদে রত রয়েছেন। এত কিছুর পরও যদি বলা হয় খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদী স্বঘোষিত খলীফা তবে সেটা কত বড় জুলম তা পাঠক নিজ জ্ঞানে বিবেচনা করবেন আশা করি।

এখানে আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসলামী বসন্ত শিরোনামের বক্তব্যের পঞ্চম পর্বে আজ-জাওয়াহারী বর্তমান খেলাফতকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষনা করার পর বলেন,

إذن ما السبيلُ الذي نختارُه لإقامةِ الخلافةِ؟

তাহলে খেলাফত কায়েমের জন্য কোন পথটি আমাদের বাছাই করা উচিৎ?

এরপর তিনি এ প্রশ্নটির বিস্তারিত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, প্রথমে

আমাদের আফগানিস্তান এবং কোকাজের ইমারতে ইসলামিয়্যাকে শক্তিশালী করা। এরপর বিশ্বের অন্যান্য জিহাদী সংগঠনসমূহকে সহযোগিতা করা যাতে তারা আমেরিকা এবং তাদের স্থানীয় এজেন্টদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এরপর মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ইসলামী ইমরাত প্রতিষ্ঠা করা। এরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপকভাবে পরামর্শ করা।

এক. খেলাফত ঘোষণা করার সময় হয়েছে কিনা বা খেলাফত ঘোষনার সকল উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে কিনা?

দুই. যদি বেশিরভাগ মুজাহিদ, সত্যপন্থী দা'য়ী, নেককার মুসলিম একমত হয় যে খেলাফতের জন্য প্রয়োজনিয় সকল উপকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার সময় হয়েছে তবে পরমর্শের মাধ্যমে কাকে খেলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা ঠিক করা হবে। এরপর যার উপর বেশিরভাগ আহলে হাল ওয়াল আকদ একমত হবে তাকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

এটাই হলো আজ-জাওয়াহেরীর মতে খেলাফত কায়েম করার সঠিক পদ্ধতি। তার মতে প্রথমেই মুসলিম উম্মাহকে খেলাফতের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করা উচিৎ হবে না বরং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রথমে পৃথক পৃথক ইমারত (রাষ্ট্র) গঠন করতে হবে। খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার আগে কয়টা পৃথক ইমারাত গঠন করতে হবে সেটা অবশ্য তিনি বলেন নি। কথাগুলো তিনি যখন বলেছেন তখন দুটো ইমারত (আফগানে এবং কোকাজে) ছিল। একটি ইমারত আরেকটি ইমারতের অধীনে ছিল না বরং উভয়ে পৃথক ছিল। তিনি ঐ সকল ইমারতকে শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং আরও কিছু পৃথক ইমারত গঠন করার পরামর্শ দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, আজ-জাওয়াহেরীর মতে খেলাফতের আন্ডারে মুসলিমদের একতাবদ্ধ করার আগে পুরা মুসলিম উম্মাহকে পৃথক পৃথক দশ বারোটি বা সম্ভব হলে আরও বেশি দলে বিভক্ত করে নিতে হবে। এবং প্রতিটি দলকে শক্তিশালী করতে হবে। এরপর সময় সুযোগ বুঝে দফায় দফায় বৈঠক করার মাধ্যমে সবগুলো ইমারতকে একজনের অধীনে একতাবদ্ধ করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার আগে তাদের দু-দশ ভাগে ভাগ করে নেওয়ার এই মতবাদটি সত্যিই খুব চমৎকার! ইবনে হিযাম আল-মিলাল ওয়ান নিহাল নামে একটি বই লিখেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন বিদয়াতী ফিরকার বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের আক্বীদা বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। তিনি যদি এ যামানায় ফিরে আসতেন তবে এই কথাটি ঐ বইয়ে বেশ মোটা অক্ষরে লিখে রাখতেন এতে বোধহয় সন্দেহ করা চলে না। খেলাফত কি একটা ফুটবল খেলার ম্যাচ যে, এগারো জন করে দু দলে

ভাগ করে দিলাম তারপর দেড় ঘন্টা ধরে খেলা করে যে বিজয়ী হয় তাকে ট্রফি দিয়ে দিলাম?

মনে হচ্ছে আজ-জাওয়াহেরী মঙ্গল গ্রহ থেকে বক্তব্য দিচ্ছেন। মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং মানুষের অন্তরের পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। কিছু লোককে কয়েকটি দলে ভাগ করে দেওয়ার পর আবার তাদের একত্রিত করা যে কতটা কঠিন সেটা বোধ হয় তিনি অনুভব করতে পারছেন না। প্রতিটি দলের প্রধান যখন পৃথক রাষ্ট্র গঠন করবেন এবং সেই রাষ্ট্রের আমীর হিসেবে নেতৃত্বের স্বাদ পাবেন তখন তাদের এক নেতার অধীনে আনাটা কতটা কষ্টকর সেটা বর্তমানে দেশে দেশে মুসলিমদের এই বিভক্তি থেকে তার শিখে নেওয়া উচিৎ ছিল। যেখানে একই দেশে দুটি জিহাদী দল আক্বীদা বিশ্বাসে কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও দলীয় পরিচয় ভুলে একতা গড়ে তুলতে পারে না সেখানে দুটি পৃথক অঞ্চলে পৃথক দুটি শক্তিশালী ইমারত গঠন করে সেগুলোকে আবার কিভাবে একতাবদ্ধ করবেন সেটা তিনি মোটেও ভেবে দেখেন নি। নিকট অতীতের ঘটনা থেকেও তিনি শিক্ষা নেন নি। সম্ভবত খেলাফত প্রতিষ্ঠার আগে মুসলিমদের যত খুশি বিভক্ত করে নিতে হয় এই নীতির উপর ভিত্তি করেই তিনি দাওলাতুল ইসলামের সাথে জাবহাতুন নুসরাকে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার ফলাফল কি হয়েছে তা তো আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি দাবী করেছেন তিনিই দাওলাতে ইসলাম এবং জাবহাতুন নুসরার আমীর। সেটা সত্য না হলেও তিনি যে উভয়ের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন সেটা সত্য। কিন্তু তিনি কি উভয়কে বিভক্ত করে দেওয়ার পর উভয়ের বিরোধকে মিমাংসা করতে পেরেছেন? তাহলে মুসলিমদের একতাবদ্ধ করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আরও বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত তিনি কিভাবে গ্রহণ করতে পারেন?

সাহাবায়ে কিরামের কর্মপন্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিমদের বিভক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়ে নয় বরং যত দ্রুত সম্ভব খেলাফতের ঘোষণা দিয়েই তারা ঐক্য রক্ষা করতেন। আবু বকর ﵁ এর সময় আনসার ও মুহাজিররা খলীফা কে হবে এ নিয়ে দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েন। এমন কি আনসাররা বলেন, (منا أمير منكم أمير) “আমাদের মধ্যে একজন আমীর তোমাদের মধ্যে একজন আমীর।” [সহীহ বুখারী] উমর ﵁ কঠোরভাবে এ প্রস্তাব বাতিল করেন। এভাবে মুসলিমদের দুটি আমীরের নেতৃত্বে বিভক্ত করে মক্কা ও মদীনাতে দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের পর উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দফায় দফায় পরামর্শ করে যতদিন একমত না করা যায় ততদিন খেলাফত প্রতিষ্ঠাকে পিছিয়ে দেওয়ার নীতি কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আজ-জাওয়াহেরী এই প্রস্তাবই দিয়েছেন।

"বেশিরভাগের পরামর্শ জরুরী" এই মতবাদটির উপর নির্ভর করতে গিয়ে তিনি কতটা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন তা লক্ষ্যণীয়।

বিপরীত দিকে আবু বকর আল বাগদাদী খেলাফতের ঘোষনা দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মুজাহিদদের বেশিরভাগই তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং তার অধীনে একতাবদ্ধ হয়েছে। এখন কেবল আয়মান আজ-জাওয়াহেরী এবং তার আমীর মোল্লা মানছুর এই দুজন ব্যক্তি বায়াত হলেই পুরো মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। এটাই কি অধিক কল্যাণকর নয়?

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যারা পরমর্শ করা হয়নি এই অজুহাতে খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফতকে অস্বীকার করে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। যেহেতু খেলাফত সঠিক হওয়ার জন্য সকলের বা বেশিরভাগের পরামর্শ নেওয়া শর্ত নয়, এটা সম্ভবও নয়।

২৯ জুন ২০১৪ ইং তারিখে প্রকাশিত যে বক্তব্যে আল-আদনানী খেলাফতের ঘোষণা দেন সেখানে তিনি এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন,

فإن قالوا لكم: ''كيف تعلنون خلافة ولم تجمع عليكم الأمة؟؛ فلم تقبل بكم الفصائل والجماعات، والكتائب والألوية والسرايا والأحزاب، والفرق والفيالق والتجمّعات، والمجالس والهيئات والتنسيقيات والرابطات والائتلافات، والجيوش والجبهات والحركات والتنظيمات''؛ فقولوا لهم} :وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ لم يُجمِعوا على أمر يومًا، ولن يجمعوا على أمر أبدًا إلا مَن رحم الله، ثم إن الدولة تجمع مَن أراد الاجتماع

যদি কেউ তোমাদের বলে, তোমরা কিভাবে খেলাফতের ঘোষণা দিলে অথচ উম্মত তোমাদের ব্যাপারে একমত হয়নি। বিভিন্ন দল, গ্রুপ, সংঘ ও সংগঠন তোমাদের গ্রহণ করে নি। .... তাদের বলো, (আল্লাহ বলেন) তারা মতপার্থক্য করতেই থাকবে। আপনার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। [হুদ/১১৮] তারা জীবনে কখনও কোনো বিষয়ে একমত হবে না। শুধু আল্লাহ যাকে চায় সে ছাড়া। আর যে একতাবদ্ধ হতে চায় দাওলাত তাকে টেনে নেবে।

এ বিষয়ে আল-আদনানীর কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের মধ্যে যারা সত্যিই খেলাফত চায় তারা পরবর্তীতে এই খলীফার নিকট বায়াত হয়ে খেলাফতের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের নিকট পরামর্শ নেওয়া হয় নি বা আমরা খেলাফতের বেশি যোগ্য এ ধরণের অজুহাত দিয়ে খেলাফত থেকে দূরে সরে যায় নি। সত্যপন্থীদের কর্মপন্থা এমনই হয়। আর যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা খেলাফত থেকে দূরে থাকার জন্য নানা রকম যুক্তি উত্থাপন করছে। যেসব যুক্তির পক্ষে কোনো দলীল প্রমাণ নেই। এমন কি সেগুলো তার নিজের

কথারই বিপরীতে। এভাবে তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং অন্যদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। অথচ নিয়ম হলো খেলাফত ঘোষণার সময় যদি কোনো সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ বাদ পড়ে যায় তবে তার জন্য উক্ত খলীফার খেলাফতকে অস্বীকার করা বৈধ হয় না। যেভাবে আলী ﵁ এর জন্য আবু বকর ﵁ এর খেলাফত থেকে দূরে থাকা বৈধ ছিল না তাই তিনি প্রথমে কিছু দিন বায়াত দিতে দেরি করলেও পরে বায়াত প্রদান করেন। একইভাবে মুয়াবিয়া ﵁ এর জন্য আলী ﵁ এর হাতে বায়াত দিতে অস্বীকার করাটা অনুচিত ছিল। এ যুগের কেউ যেনো আবার নিজেকে তাদের চেয়ে উত্তম মনে না করে বসে।

তাছাড়া খেলাফতের ঘোষণার ব্যাপারে কাউকে কিছু জানানো হয়নি সেটা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। যেহেতু খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার মাস খানেক আগে **১১** মে ২০১৪ ইং তারিখে প্রকাশিত ‘দুঃখিত হে আল-কায়েদার আমীর’ শিরনামে একটি বক্তব্যে আল-আদনানী বলেছিলেন, নিরপেক্ষ শারয়ী আদালত গঠনের পরিবর্তে আসুন একজনকে খলীফা নিয়োগ করে খেলাফতের ঘোষণা দিই। কিন্তু সেদিন তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। তারা বলেছে এখনও খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার সময় হয় নি। তারা চেয়েছেন আজ-জাওয়াহেরীর উপরে বর্ণিত পন্থায় মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার পর তাদের একতাবদ্ধ করে খেলাফত কায়েমের চেষ্টা করতে। এই হাস্যকর পন্থাটি যদি কেউ অস্বীকার করে এবং প্রথমেই মুসলিমদের একতাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে খেলাফতের ঘোষণা দিতে চায় তবে তারা কি করবে? যারা মনে করে এখনও খেলাফতের সময় হয়নি বা এখন খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তাদের সাথে পরামর্শ করবে নাকি যারা এখনই খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজনিয়তা স্বীকার করে তাদের সাথে পরামর্শ করে ঘোষণা দিয়ে দেবে? নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ একথা বলতে পারে না যে আমাদের পরামর্শ নেওয়া হয়নি। কারণ তারা মূল কাজটিই এখন করতে চান নি।

এখন খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার সময় হয়েছে কি?

ইসলামী বসন্তের তৃতীয় পর্বে আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

المجاهدين تحقق لهم في بعضِ البقاعِ نوعُ تمكنٍ لا يرقى للخلافةِ، وأننا بدلًا من التسابقِ على ادعاءِ ألقابٍ وأوصافٍ لا حقيقةَ لها، علينا أن نقويَ ونمكنَ للكياناتِ الجهاديةِ الإسلاميةِ الموجودةِ بالفعلِ

মুজাহিদরা বিভিন্ন স্থানে কিছুটা বিজয় অর্জন করেছে কিন্তু তা খেলাফত প্রতিষ্ঠার মতো পর্যায়ে পৌঁছায় নি। অতএব, আমাদের উচিৎ হবে বাস্তব জগতে অস্তিত্ব নেই

এমন কিছু নাম বা খেতাব (খলীফা বা খেলাফত) নিয়ে টানাটানি না করে শক্তি অর্জন করা এবং যেসব জিহাদী সংগঠন বিদ্যমান আছে সেগুলোর অবস্থানকে শক্তিশালী করা।

সমস্যা হলো তারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি অর্জনের কথা বলছেন কিন্তু নুন্যতম কতটুকু শক্তি অর্জন করলে খেলাফতের ঘোষণা দেওয়া যায় সেটা কিন্তু একবারও বলছেন না। খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হলে শক্তি অর্জন করতে হবে এটা নিশ্চয় সঠিক কথা কিন্তু দাওলাতে ইসলামের সেই শক্তি আছে কিনা এটা বুঝতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে সর্বনিম্ন কতটুকু শক্তি দরকার। ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করার পরও খেলাফত কায়েমের শক্তি তাদের কেনো নেই বা খেলাফত কায়েম করার মতো অবস্থা কেনো হয় নি সেটা আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে চায়।

পূর্বে যখন আজ-জাওয়াহেরী বলেছিলেন, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট উপকরণ দাওলাতের নিকট নেই তার উত্তরে আদনানী বলেছিলেন,

فنسألُكَ باللهِ عليك أن تذكرَ لنا أدنى مقوّمات الدولة التي قِيلَ لكَ أنّها لم تتوفّر عندنا، فلعلّنا نبيّنها لكَ إن جهِلتَها، أو نحقّقها إن فقدناها

আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বনিম্ন কতটুকু উপকরণ দরকার সেটা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। যেটা আমাদের নেই বলে আপনাকে জানানো হয়েছে। হয়তো আমরা প্রমাণ করে দেবো আসলে আমাদের সে শক্তি আছে অথবা যদি না থাকে তবে সেটা অর্জনের চেষ্টা করবো।

[দুঃখিত হে আল-কায়েদার আমীর শিরোনামে প্রকাশিত]

আদনানীর এই কথাটি অত্যন্ত চমৎকার। বাতিলপন্থীরা যখন কোনো উত্তম কাজ থেকে মুসলিমদের ফিরাতে চায় তখন সহজভাবে বলে এখনও এটা করার সময় হয়নি। সময় হলে আমরা সবাই মিলে করবো। কিন্তু কখন সময় হবে সেটা স্পষ্ট করে বলে না। জিহাদ করার কথা বললে, ওলামা-মাশায়েখরা বলেন,

— জিহাদ তো করতে হবে কিন্তু এখন তার উপযুক্ত সময় নয়।

কিন্তু উপযুক্ত সময় কখন হবে সে বিষয়ে তারা কোনো কথা বলেন না। এভাবে যুগের পর যুগ ধরে সময় হয়নি এই অজুহাতে তারা জিহাদ পরিত্যাগ করেন এবং অন্যকে তা পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করেন।

বর্তমানে আজ-জাওয়াহেরী এবং তার অনুসারীরা খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই

কৌশল গ্রহণ করেছেন। তারা বলছেন খেলাফত তো আমরা সবাই চায় কিন্তু এখনও তা ঘোষণা করার সময় হয় নি। যখন সময় হবে তখন আমরা ঘোষণা করবো। প্রশ্ন হলো সময় কখন হবে এবং এখন কেনো সময় হয়নি?

এ বিষয়ে তারা কেউই স্পষ্ট করে কিছুই বলছেন না। তবে এলোমেলো যুক্তি উথাপন করছেন। কেউ বলছেন,

— এখনও যুদ্ধাবস্থা রয়েছে এসব যুদ্ধ শেষ হয়ে স্থীরাবস্থা আসুক। তখন খেলাফত ঘোষণা করা হবে।

আজ-জাওয়াহেরী নিজেই এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

وهي أننا في مرحلةِ دفعٍ للعدوِ الصائلِ على المسلمين

আমরা এখন মুসলিমদের উপর আক্রমনকারী শত্রুকে প্রতিহত করার স্তরে রয়েছি।

[ইসলামী বষন্ত-৩য় পর্ব]

অর্থাৎ বর্তামানে আমরা যুদ্ধাবস্থায় রয়েছি এই যুদ্ধাবস্থা কাটিয়ে উঠলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার স্তর শুরু হবে।

যারা এভাবে চিন্তা করে তারা নির্বোধ ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু কাফিরদের সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, (ولا يزالون يقاتلونكم) “কাফিররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে ..” [বাকারা/২১৭]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটা দল যুদ্ধ করতে থাকবে। এছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে (الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به) “ইমাম হলো ঢাল স্বরুপ তার অধীনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং নিরাপত্তা অর্জিত হয়” সুতরাং যুদ্ধ অবস্থায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এটা সঠিক নয় বরং তখন খলীফার অধিক প্রয়োজন। খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ শেষ হয়ে স্থির অবস্থা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফত কায়েম হবে না। একারণে যে সত্যিই খেলাফত চায় তার পক্ষে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য এসব শর্ত জুড়ে দেওয়াটা সমীচিন নয়। অবশ্য যে মুখে খেলাফতের দাবী করে কিন্তু আসলে তা চায় না তার পক্ষে এ ধরণের শর্ত জুড়ে দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আয়মান আজ-জাওয়াহেরী এখন এ ধরণের আচরণ করছেন। অথচ পূর্বে তিনি নিজেই এ আপত্তির জবাব দিয়েছেন।

খোলা আলোচনা শীর্ষক বক্তব্যের দ্বিতীয় পর্বে ইরাকের দাওলাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার

সময় তামকীন (التمكين) তথা প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ ছিল না এমন একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। শায়েখ উসামা বিন লাদিনের বক্তব্য থেকেও তিনি এ প্রশ্নের জবাব উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

ويقول عمن يعترض على دولة الإسلام بأنها غير ممكنةٍ تمكيناً تاماً: "ومن تدبر كيف حال دولة الإسلام الأولى يوم أحدٍ ويوم الأحزاب إذ بلغت القلوب الحناجر، ويوم أن ارتدت جزيرة العرب إلا قليلاً بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلم أن التمكين المطلق ليس شرطاً لانعقاد البيعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام. فلا يصح أن يقال لمن بويع على إمارةٍ إسلاميةٍ، نحن لا نسمع لك ولا نطيع لأن العدو يستطيع إسقاط حكومتك.

যে ব্যক্তি ইরাকের দাওলাতে ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলে এর তো এখনও পরিপূর্ণ তামকীন (تمكين) তথা শক্তি সামর্থ নেই তাদের জবাবে তিনি (শায়েখ উসামা বিন লাদিন) বলেন, যে কেউ উহুদের দিন বা খন্দকের দিন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র (মদীনার রাষ্ট্র) কি অবস্থায় ছিল এটা লক্ষ্য করে এবং রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর ওফাতের পর (আবু বকর رضي الله عنه এর খেলাফতকালে) যখন অল্প কিছু লোক ছাড়া আরব উপদ্বীপের সকল মানুষ ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে গিয়েছিল তখনকার অবস্থা অবলোকন করে সে নিশ্চিত বুঝতে পারবে যে ইমাম (খলীফা) এর হাতে বায়াত হওয়ার জন্য বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ শর্ত নয়। যখন একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো আমীরের হাতে বায়াত নেওয়া হয় তখন এমন বলা কখনও বৈধ হবে না যে আমি তোমার নিকট বায়াত হবো না যেহেতু শত্রু যে কোনো মুহুর্তে তোমাকে পরাজিত করতে সক্ষম।

এক পর্যায়ে তিনি নিজেই বলেন,

أقول للذين يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض؛ هل يستطيع أحدٌ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر على الأقل على كيلومتر مربعٍ واحدٍ من أرض العراق؟ فإن كان الجواب بنعمٍ، وهو كذلك بفضل الله، إذن فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلاميةً على الأرض التي تسيطر عليها؟ وكم كانت مساحة دولة المدينة المنورة قبل غزوة الأحزاب؟ وكيف كان حالها في غزوة الأحزاب

যারা ইরাকের দাওলাতে ইসলামের শক্তি সামর্থ এবং কতটুকু এলাকা দখল করেছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাদের বলবো, দাওলাতে ইসলাম কি কমপক্ষে এক বর্গ কিলোমিটার স্থান দখল করে নি? যদি এর উত্তর হ্যাঁ সূচক হয় এবং আল্লাহর প্রশংসা যে সেটাই সঠিক তবে যতটুকু এলাকা তারা দখল করেছে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা বাধা দিচ্ছো কেনো? খন্দকের যুদ্ধের আগে মদীনা রাষ্ট্রের অবস্থা কি ছিল?

এরপর তিনি বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেন যাতে ঐ সময় মুমিনদের দূর্বলতা,

অনিরাপত্তা ও দুরাবস্থার কথা বর্ণিত আছে।

অর্থাৎ এই অবস্থায় যদি মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বৈধ হয় তবে এখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অপরাধ হবে কেনো?

এছাড়া দাওলাতে ইসলাম ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যে প্রশংসিত ভূমিকা রাখছে তিনি সেসব বর্ণনা করেন।

এসবই আজ-জাওয়াহেরীর মুখের বক্তব্য অথচ পরবর্তীতে শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরক্ষার জন্য একটি স্বাক্ষ্য শিরোনামে প্রকাশিত বক্তব্যে তিনিই ইরাক ও শামে দাওলাতে ইসলাম ঘোষণা করা সম্পর্কে বলেছেন,

فمقومات الدولةِ حتى الآن لم تتوفرْ في الشامِ

শামে এখনও পর্যন্ত দাওলাতে ইসলাম ঘোষণা করার অবস্থা সৃষ্টি হয় নি।

এখন যদি আমরা তার প্রশ্ন ঘুরিয়ে তার নিকটই পেশ করে বলি,

— শামে কি এক বর্গ কিলোমিটার ভূমি মুজাহিদদের দখলে নেই?

তবে তিনি কি উত্তর দেবেন? একেই বলে ভাগ্যের লিখন। উত্তরদাতা নিজেই আজ হয়ে গেছেন অভিযোগকারী এবং তারই উত্তর এখন তাকে শোনাতে হচ্ছে।

শেষে আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

ولذا فإني أسأل الذين يشككون في دولة العراق الإسلامية لمصلحة من هدم وتقويض دولةٍ إسلاميةٍ قامت بعد طول انتظارٍ في قلب العالم الإسلامي؟

যারা ইরাকের দাওলাতে ইসলামের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে তাদের বলবো, বহু দিন অপেক্ষায় থাকার পর যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করলে কার লাভ?

এই একই প্রশ্ন আমরা এখন তাকে করবো,

— বহু অপেক্ষার পর যে খেলাফত কায়েম হয়েছে সেটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করলে কার লাভ?

অনেকে বলবেন তখন তো তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন খেলাফত তো নয়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তিনি যে উদাহরণ থেকে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সেটা কিন্তু রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মদীনা রাষ্ট্র বা আবু বকর رضي الله عنه এর সময়কার ইসলামী রাষ্ট্র। বলাই বাহুল্য যে, প্রথমটা নুবয়তের যুগ আর

পরেরটা নবুয়তের আদলে খেলাফতের যুগ। সুতরাং ঐ উদাহরণের মাধ্যমে কেবল নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় তা নয় বরং ঐ ধরণের দূর্বল অবস্থায় সকল সীমানা-প্রচীরের উর্ধে খেলাফতের ঘোষণা দেওয়াও বৈধ প্রমাণিত হয়। একারণে উসামা বিন লাদিন সুস্পষ্ট বলেছেন,

أن التمكين المطلق ليس شرطاً لانعقاد البيعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام. فلا يصح أن يقال لمن بويع على إمارةٍ إسلاميةٍ، نحن لا نسمع لك ولا نطيع لأن العدو يستطيع إسقاط حكومتك

ইমাম (খলীফা) এর হাতে বায়াত হওয়ার জন্য বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ শর্ত নয়।

এখানে তিনি আবু বকর ﷺ এর খেলাফত কালের উদাহরণ থেকে শক্তি সামর্থে দূর্বলতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র কায়েম করা এবং ইমাম বা খলীফার নিকট বায়াত হওয়া উভয় ক্ষেত্রে বৈধতার রায় দিয়েছেন।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। পাঠক লক্ষ্য করলে দেখবেন আজ-জাওয়াহেরী নিজে যে কথা বলেছেন এবং শায়েখ উসামা বিন লাদিন এর যে কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন এখন কিন্তু তিনি তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন। তখন তিনি এক বর্গ কিলো মিটার স্থান হলেও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন কিন্তু এখন বলছেন শামে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পন্ন হয় নি। অথচ শামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুজাহিদদের দখলে রয়েছে। তাহলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কি উপকরণ দরকার? এই প্রশ্নের উত্তরটাই আল-আদনানী আজ-জাওয়াহেরীর কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু আজ-জাওয়াহেরী সে উত্তর দেননি, কখনও দেবেন বলে মনেও হয় না। যেহেতু শরীয়তের দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করা যায় শামে দাওলাতে ইসলামের হাতে তা মজুদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ মানুষ তাদের রাষ্ট্রকে মেনে নিইনি। কেনো মেনে নেবো না সেটাও স্পষ্ট করে বলে নি। কতটুকু ক্ষমতা অর্জন করলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটাও তারা নির্ধারন করে নি।

বর্তামানেও আজ-জাওয়াহেরী অনুরুপ কৌশল অবলম্বন করেছেন। কেবল বলছেন খেলাফত কায়েমের মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু কি করলে পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা বলছেন না। এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব অবশ্য তিনি দিয়েছেন।

ইসলামী বসন্ত শিরোনামের আলোচনার পঞ্চম পর্বে কখন খেলাফতের সময় হবে সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উপরে আমরা তার কথা উল্লেখ করেছি। প্রথমেই তিনি বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৃথক পৃথক শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর তিনি বলেন,

إذا اتفق جمهورُ المجاهدين والدعاةِ الصادقين وأهلِ الفضلِ من المسلمين على أن مقوماتِ إعلانِ الخلافةِ قد اكتملت، وأن الظروفَ ملائمةٌ لإعلانِها، فتتمُ المشورةُ حول من يصلحُ لتولي هذا المنصبِ

যখন বেশিরভাগ মুজাহিদ সত্যপন্থী দায়ী, এবং নেতৃস্থানীয় মুসলিমরা এ বিষয়ে একমত হবে যে, খেলাফতের ঘোষণা দেওয়া জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং খেলাফতের ঘোষনা দেওয়ার উপযুক্ত সময় হয়েছে। তখন কে খলীফা হওয়ার যোগ্য সে বিষয়ে পরামর্শ করা হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু সংখ্যক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার সময় হয়েছে কিনা তা নিয়ে পরামর্শ করতে হবে এবং বেশিরভাগ মুজাহিদ, হকপন্থী দায়ী আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মতামত দিলে খেলাফত কায়েম করা হবে। অর্থাৎ মুসলিমদের শক্তি, ক্ষমতা বা অবস্থান যতই শক্তিশালী হোক সেটা খেলাফত কায়েমের জন্য যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না বেশিরভাগ লোক তাতে সম্মতি জানায়। বেশিরভাগের মতামত না পাওয়া গেলে কোনো অবস্থাতেই খেলাফত কায়েম করা যাবে না। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত একটি ফরজ দায়িত্ব মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের ইচ্ছা হলে এটা প্রতিষ্ঠা করবে, না চাইলে করবে না। মুসলিমদের শক্তি সামর্থ যতই বৃদ্ধি পাক বেশিরভাগ লোক না চাইলে সারা জীবনে খেলাফত কায়েম করা হবে না। এর চেয়ে বড় বিভ্রান্তি আর কি হতে পারে!

খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী এবং তাঁর মজলিসে শুরা কি অজ্ঞাত?

এখানে আরও একটি সংশয় উত্থাপন করা হয়। বলা হয়, আবু-বকর আল-বাগদাদীর নিকট যে মজলিসে শুরা বায়াত হয়েছে তারা সব অজ্ঞাত লোক। আর অজ্ঞাত লোকের বায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী বসন্ত শিরোনামের আলোচনার তৃতীয় পর্বে আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

ثم أعلنوا خلافةً فجأةً عقدها مجهولون

এরপর তারা হঠাৎ করে খেলাফতের ঘোষণা দিয়েছে যা কিছু অজ্ঞাত লোকের বায়াতের মধ্যমে হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে তিনি আবু বকর আল-বাগদাদীর মাজলিসে শুরাকে অজ্ঞাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কোনো কোনো নির্বোধ লোক তো এমনও বলেছে যে

স্বয়ং আবু বকর আল-বাগদাদীই নাকি অজ্ঞাত। তাই তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এধরণের একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু স্বয়ং আজ-জাওয়াহেরী উসামা বিন লাদিনের বরাতে বর্ণনা করেছেন। লিকায়ে মাফতুহ তথা খোলা আলোচনা শীর্ষক বক্তব্যের দ্বিতীয় পর্বে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করে, ইরাকের দাওলাতে ইসলামের প্রথম আমীর আবু উমর আল-বাগদাদী সম্পর্কে কেউ কেউ এমন দাবী করে যে, তিনি অজ্ঞাত। অতএব তার হাতে বায়াত হওয়া যাবে না।

এর উত্তরে আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

يقول الشيخ أسامة بن لادنٍ حفظه الله عمن يعترض على الشيخ أبي عمر البغدادي بأنه من المجهولين:"**وهنا مسألةٌ؛** إن معظم الناس لا يعرفون سيرة أمراء المجاهدين في العراق، فأقول؛ سبب ذلك ظروف الحرب ودواعيها الأمنية، إلا أني أحسب أن الجهل بمعرفة أمراء المجاهدين في العراق جهلٌ لا يضر، إذا زكاهم الثقات العدول

যে ব্যক্তি শায়েখ আবু উমর অজ্ঞাত হওয়ার কারণে তার উপর আপত্তি তোলে তার সম্পর্কে শায়েখ উসামা বিন লাদিন বলেন, এখানে একটা ব্যাপার রয়েছে, বেশিরভাগ লোক ইরাকের মুজাহিদ নেতাদের চেনে না। এটা যুদ্ধাবস্থা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে। তবে আমি মনে করি ইরাকের মুজাহিদ নেতাদের না চেনার কারণে কোনো সমস্যা নেই যেহেতু অনেক বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে উত্তম স্বাক্ষ্য দিয়েছেন।

এরপর তিনি (বিন লাদিন) বলেন,

فالامتناع عن مبايعة أميرٍ من أمراء المجاهدين في العراق -بعد تزكيته من الثقات العدول- بعذر الجهل بسيرته يؤدي إلى مفاسدٍ عظامٍ، من أهمها تعطيل قيام جماعة المسلمين الكبرى تحت إمامٍ واحدٍ، وهذا باطلٌ".

ইরাকের মুজাহিদদের কোনো একজন নেতার পক্ষে বিশ্বস্ত লোকদের মন্তব্য পাওয়ার পরেও অজ্ঞাত হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে তার বায়াত হতে বিরত হওয়ার ফলাফল মারাত্মক ক্ষতিকর। এর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয়টি হলো, এটা এক ইমামের নেতৃত্বে মুসলিমদের একটি বড় জামাত গঠনে বাধা সৃষ্টি করে আর এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর নিকট বায়াত হয়েছে প্রথমত দাওলাতে ইসলামের মজলিসে শুরা এবং ইরাক ও সিরিয়ার মুজাহিদরা। তারপর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বায়াতের অঙ্গীকার এসেছে। বিশেষভাবে আবু বকর আল-বাগদাদী এবং সাধারণভাবে সকল ইরাকী মুজাহিদদের ব্যাপারে আল-জূলানী পূর্বে যে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। তিনি বলেছেন,

وقد علم الله جل في علاه أنّا ما رأينا من إخواننا في العراق إلا الخير العظيم من الجود والكرم وحسن الجوار وأن أفضالهم لا تعد ولا تحصى وهو دين لا يفارق أعناقنا ما حيينا

মহান আল্লাহ জানেন যে আমরা আমাদের ইরাকের ভাইদের নিকট খারাপ কিছু পাই নি। কেবল প্রভূত কল্যাণ, সহোযোগিতা ও উত্তম অবস্থানই পেয়েছি। আর তাদের অবদান গুনে শেষ করার মতো নয়। এটা আমাদের কাঁধে এমন একটা ঋণ যা বেঁচে থাকা অবধি আমরা ভুলবো না।

এরপর তিনি শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদীর সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেছেন। আজ-জাওয়াহেরী নিজেও আবু বকর আল-বাগদাদীর প্রশংসা করেছেন। আল-জুলানী যদি আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর নিকট বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়ে থাকে তবে তার এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার তো আমল করা দরকার। তাছাড়া কোকাজের মুজাহিদদের সম্পর্কে আজ-জাওয়াহেরী তো পূর্বে বেশ ভাল প্রশংসা করেছেন। পরবর্তীতে তারাও খলীফার হাতে বায়াত হয়েছেন। মিসরের সাইনা এলাকার 'আনসারু বাইতিল মাকদিস', নাইজেরিয়ার বোকো হারাম, তারা সবাই কি অজ্ঞাত? তারাও তো খলীফা আবু বকর আল বাগদাদীর হাতে বায়াত হয়েছে। এই খলীফা এবং খেলাফতকে ভাল মনে করেছে বলেই তো তারা বায়াত হয়েছে। এতগুলো লোকের সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বলে আবু বকর আল-বাগদাদী নিজে অজ্ঞাত বা তার হাতে কেবল অজ্ঞাত লোকেরা বায়াত হয়েছে তবে সেটা কি রাজনৈতিক বক্তব্য হয়ে যাবে না?

এটা যে একটা রাজনৈতিক বক্তব্য তার আরও কিছু প্রমাণ রয়েছে। ৯ ই জুন ২০১৩ ইং তারিখে প্রকাশিত যে বক্তব্যে আজ-জাওয়াহেরী দাওলাতুল ইসলাম এবং জাবহাতুন নুসরার মধ্যে রায় ঘোষণা করেন সেখানে এক পর্যায়ে বলেন,

يقر الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني أميرا علي دولة العراق الاسلامية لمدة عام من تأريخ هذا الحكم يرفع بعدها مجلس شوري دولة العراق الإسلامية تقريرا للقيادة العامة في جماعة قاعدة الجهاد عن سير العمل تقرر بعده القيادة العامة استمرار الشيخ أبي بكر البغدادي الحسيني في الإمارة أو تولية أمير جديد

শায়েখ আবু বকর আল বাগদাদীকে ইরাকের দাওলাতে ইসলামের আমীর হিসেবে এই রায় প্রকাশের পর থেকে এক বছরের জন্য বহাল রাখা হবে। তারপর ইরাকের দাওলাতে ইসলামের মাজলিসে শুরা আল-কায়েদার নেতাদের নিকট তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবেন। তারপর উর্ধ্বতন নেতারা সিদ্ধান্ত নেবেন তাকে বহাল রাখবেন না কি অন্য কাউকে নিয়োগ দেবেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে আয়মান আজ-জাওয়াহেরী ইরাকের দাওলাতে ইসলামের মজলিসে শুরাকে তার নিকটা রিপোর্ট করার দায়িত্ব দিচ্ছেন। যাতে তিনি সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করতে পারেন আবু বকর আল বাগদাদীকে বহাল রাখবেন নাকি বরখাস্ত করবেন।

প্রশ্ন হলো, যদি ইরাকের দাওলাতে ইসলামের মজলিসে শুরা তার নিকট অজ্ঞাত হয় তবে কি তিনি কিছু অজ্ঞাত লোককে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং অজ্ঞাত লোকের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ইরাকের দাওলাতে ইসলামের আমীর কে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করলেন? এই মজলিসে শুরা আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে বায়াত হলে সেটা অজ্ঞাত লোকের বায়াত হিসেবে অগ্রহণযোগ্য হলে সেই সব অজ্ঞাত লোকের কথা শুনে অন্য কাউকে দাওলাতে ইসলামের আমীর নিয়োগ করা আজ-জাওয়াহেরীর জন্য কিভাবে বৈধ হতো?

এই বক্তব্যে আজ-জাওয়াহেরী আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

بل لقد أحببنا أحبابنا وإخواننا في جبهة النصرة من ثناء الشيخ أبي بكر البغدادي وإخوانه عليهم وعلي أميرهم الشيخ أبي محمد الجولاني

আমরা তো শায়েখ বাগদাদী এবং তার নিকটস্থ ব্যক্তিদের মুখে প্রসংশা শুনেই জাবহাতুন নুসরার ভাইদের এবং তাদের আমীর আল-জুলানীকে ভালবাসতে শুরু করেছি ।

তবে কি তিনি কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কথা শুনে অন্য কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তিকে ভালবাসতে শুরু করেছেন?

এছাড়া ২-৫-২০১৪ ইং তারিখে "শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরক্ষার জন্য একটি সাক্ষ্য" শিরোনামে প্রকাশিত যে বক্তব্যে তিনি তার নিকট দাওলাতে ইসলামের বায়াত প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেখানে দাওলাতে ইসলামের নেতৃস্থানীয়রা তার নিকট চিঠি-পত্র আদান প্রদান করতো এমন মন্তব্য করেছেন। এমন কি তিনি আল-আদনানীর একটি পত্র সেখানে উল্লেখও করেছেন। তিনি নিজেও ইরাকের মুজাহিদ ভাইদের নিকট চিঠি প্রেরণ করতেন এ প্রমাণও সেখানে রয়েছে।

সুতরাং আজ-জাওয়াহেরীর নিজের কথায় এটা প্রমাণিত হয় যে তিনি ইরাকের দাওলাতে ইসলামের আমীর আবু বকর আল-বাগাদাদী এবং তার মজলিসে শুরা ও ইরাকের মুজাহিদদের ভাল মতোই চেনেন। কিন্তু এখন তর্কের খাতিরে সেটা অস্বীকার করছেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করছেন। অতএব উপরে উল্লেখিত বিন লাদিনের যে বক্তব্য আজ-জাওয়াহেরী নিজেই বর্ণনা করেছেন

সে অনুযায়ী আজ-জাওয়াহেরীর এই কথাটি অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়।

এই খলীফার পূর্বে কোনো খলীফার হাতে বায়াত আছে কি?

পূর্বে আমরা একটি হাদীস উল্লেখ করেছি যেখানে বলা হয়েছে একই যুগে একাধিক খলীফা থাকলে প্রথম ব্যক্তির বায়াত পূর্ণ করতে হবে। এই মূলনীতির আলোকে কেউ কেউ আবু বকর আল বাগদাদীর খেলাফতের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চায়। তারা বলে আবু বকর আল বাগদাদীর পূর্বেই তো মোল্লা উমরের নিকট বায়াত ছিল। কেউ কেউ বলেছেন এ বায়াত নাকি খেলাফতের বায়াত। অর্থাৎ মোল্লা উমর প্রথম খলীফা আর আবু বকর আল-বাগদাদী পরের খলীফা অতএব তার বায়াত পরিত্যাগ করে প্রথম খলীফার বায়াত পূর্ণ করতে হবে। কেউ কেউ আবার এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে আবু বকর আল-বাগদাদী মোল্লা ওমরের হাতে বায়াত ছিলেন কিন্তু পরে তিনি তা ভঙ্গ করেছেন।

আয়মান আজ-জাওয়াহেরী ইসলামী বসন্তের প্রথম পর্বে আবু বকর আল-বাগদাদীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

من نكث بيعتَه لأميرِ المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حفظه اللهُ،

যে ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন তার বায়াত ভঙ্গ করে।

একই বক্তব্যের অন্য স্থানে তিনি উসামা বিন লাদিন আফগানস্থানের ইসলামী ইমরাতের নিকট বায়াত ছিলেন এটা বর্ণনা করার পর বলেন,

بل البغداديُ نفسُه كان مبايعًا لها، ثم تمرد على هذه البيعةِ ونكثَها

বরং আল-বাগদাদী নিজেই আফগানস্থানের ইসলামী ইমরাতের নিকট বায়াত ছিল। এরপর সে সীমালঙ্ঘন করে এবং এ বায়াত ভঙ্গ করে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যে বক্তব্যে আজ-জাওয়াহেরী দাওলাতে ইসলামের বায়াত প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেখানে দাওলাতে ইসলাম আল-কায়েদার নিকট বায়াত ছিল এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং সে বিষয়েই দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। পূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে তিনি মিথ্যা বলেছেন। তার নিজের কথার মাধ্যমেই এই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এখন সেই মিথ্যায় আরও একটি জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা যোগ করে বলছেন দাওলাতে ইসলাম সরাসরি মোল্লা উমর বা ইমারতে আফগানের নিকট বায়াত ছিল। অথচ পূর্বের বক্তব্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, আফগানিস্তানের

ইসলামী ইমারত, ইরাকের দাওলাতে ইসলাম এবং কোকাজের ইসলামী ইমারত কেউ কারও নিকট বায়াতবদ্ধ নয়।

এভাবে বারবার মিথ্যা বলার কারণে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যাটি ফাঁস হয়ে যায়। প্রমাণিত হয় যে, মোল্লা ওমর এসব ঘটনার আড়াই বছর আগেই তথা ২০১৩ সালের ২৩ ই এপ্রিল মারা গেছেন। অথচ আড়াই বছর ধরে তার মৃত্যুর খবর গোপন রেখে এবং তার নামে জাল বার্তা প্রেরণ করে তালেবান নেতারা পুরা উম্মতকে ধোকা দিয়েছে তাদের সাথে শরীক হয়েছে আল-কায়েদার আমীর আজ-জাওয়াহেরী নিজে। তিনি মোল্লা উমরের মৃত্যুর আড়াই বছর পর তার হাতে বায়াত হওয়ার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করছেন এবং আবু বকর আল বাগদাদীর উপর তার বায়াত ভঙ্গ করার অপবাদ দিচ্ছেন।

এর মাধ্যমে আবু বকর আল বাগদাদী মোল্লা ওমরের হাতে আদৌ বায়াত ছিলেন কিনা বা মোল্লা ওমরের বায়াত খেলাফতের বায়াত ছিল কিনা এসব বিতর্কের অবসান ঘটে। যেহেতু আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করা হয়েছে ২০১৪ সালের জুন মাসে আর মোল্লা ওমর মারা গেছেন তার এক বছরের অধিক কাল আগে। এর মাধ্যমে আবু বকর আল বাগদাদীর বায়াতের আগে একজন খলীফা ছিলেন যার হাতে মুসলিম উম্মাহ বায়াত হয়েছিল এ দাবী বাতিল হয়ে যায়।

সর্বোপরি প্রকৃত সত্য হলো মোল্লাহ উমর (রহ) সমগ্র মুসলিম জাহানের খলীফা হিসেবে বায়াত গ্রহণ করেন নি। তালেবানদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বক্তব্য ও বার্তা বিশ্লেষণ করলে সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এমন কি আজ-জাওয়াহেরী নিজেই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। সেসব বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

১৬ ই জুন ২০১৫ ইং তারিখে মোল্লাহ আখতার মনছুর দাওলাতে ইসলামের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি দাওলাতে ইসলামকে আফগানিস্তানে পৃথক শাখা না খুলতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন,

والإمارة الإسلامية من منطلق الأخوة الدينية لا تنوي إلا الخير لكم، ولا تريد التدخل في شؤونكم، و تتوقع بالمقابل منكم التعامل بالمثل

ইমারতে ইসলামিয়্যা দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের কারণে আপনাদের কোনো অমঙ্গল চায় না। এবং আপনাদের নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলাতে চায় না। এর বিপরীতে আপনাদের নিকট থেকেও অনুরুপ ব্যবহার আশা করে। [মাসিক আস-সমুদ, সংখ্যা ১১১]

মোল্লাহ মানছুর যখন একথা বলেছেন তখনও মোল্লাহ উমরের মৃত্যুর খবর ফাঁস হয়নি। তিনি মোল্লা ওমরের নায়েব তথা এসিস্টেন্ড হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি এখানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারত দাওলাতুল ইসলামের নিজস্ব বিষয়ে নাক গলাতে চায় না। দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকেও তারা একই আচরণ আশা করে।

এ পত্রে বারবার তিনি আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতকে বিভক্ত না করার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সাথে এও ঘোষণা করেন যে আপনাদের নিজস্ব ব্যাপারে আমরা নাক গলাবো না। এভাবে আফগানিস্তানের বাইরে ইমরাতে ইসলামিয়ার কোনো পদক্ষেপ যে নেই সেটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেন।

এমনকি মোল্লাহ উমরের মৃত্যুর খবর ফাঁস হওয়ার পর যখন তালেবানরা আখতার মনছুরকে তাদের আমীর হিসেবে মনোনিত করে তখন আয়মান আজ-জাওয়াহেরীও তার নিকট বায়তের ঘোষণা দেন। তবে তিনিও কিন্তু মনছুরের হাতে খেলাফতের বায়াত দেননি। বরং সারা বিশ্বের তাগুতী শক্তির সাথে জিহাদ করে খেলাফত কায়েম করার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেন। অর্থাৎ আয়মান আজ-জাওয়াহেরীও তাকে খলীফা মনে করেন নি বরং তিনি বিশ্বের সকল তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খেলাফত কায়েম করবেন এমন আশা করেছেন। পরবর্তীতে একটি বার্তায় মনছুর বিশ্বের সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার ঘোষণা দিয়ে সেই দায়িত্বকেও অস্বীকার করেছেন।

সুতরাং বিশ্বের মুজাহিদদের মধ্যে এখন কেবল একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি খেলাফতের দাবী করছেন। দ্বিতীয় কেউ খেলাফতের দাবীই করেনি। খলীফা হিসেবে অন্য কারও নামও প্রস্তাব করে নি। কেউ কেউ অবশ্য খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে এমন পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছে যাতে হাজার বছরেও খেলাফত কায়েম করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় বর্তমান খলীফা এবং তার খেলাফত থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ আছে কি?

অনেকে হয়তো বলবেন, বর্তমানে আর কোনো খলীফা নেই এটা সঠিক কিন্তু বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদদের স্থানীয় আমীর তো রয়েছে তাদের বায়াত ভঙ্গ করে আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে বায়াত হওয়া কি উচিৎ হবে।

যারা বিভিন্ন প্রকার বায়াতের প্রকারভেদ এবং তার মধ্যে খেলাফতের বায়াতের বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত নয় তারা এধরণের কথা বলে থাকে। অনেকে বলে প্রথম বায়াত পূর্ণ করতে হবে সেটা খেলাফতের বায়াত হোক বা যে বায়াতই হোক।

আবু মুনযির আশ-শানকিতী নামের একজন আল-কায়েদাপন্থী আলেম "শরীয়তের মানদন্ডে খেলাফতের ঘোষণা" (إعلان الخلافة في الميزان الشرعي) শিরোনামে একটি লেখায়

একথা বলেছেন। তিনি বলেন,

أي أن حكم الخليفة لا يعطى إلا لأول أمير بويع بيعة الشرعية, وإن لم يدّع أنه خليفة لأن تلك البيعة هي الخلافة في اعتبار الحقيقة الشرعية

অর্থাৎ খলীফার মর্যাদা প্রথম যার নিকট মানুষ শরীয়ত সম্মত বায়াত হয় তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না যদিও উক্ত ব্যক্তি নিজেকে খলীফা হিসেবে দাবী না করে। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে ঐ বায়াতই খেলাফত হিসেবে গণ্য।

একারণে তিনি উক্ত লেখার মধ্য আবু বকর আল বাগদাদীর নিকট খেলাফতের বায়াত হওয়ার বিষয়টিকে বাতিল করেন যেহেতু তার আগে মোল্লা উমরের বায়াত রয়েছে। যদিও মোল্লা ওমরের বায়াত খেলাফতের বায়াত না হয়।

এটা একটা সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা। যে হাদীসে প্রথম বায়াত পূর্ণ করতে বলা হয়েছে সেখানে আসলে খেলাফতের বায়াতের কথা বলা হয়েছে। তিনি যে কোনো বায়াতের উপর এ নীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি।

উপরে আমরা উল্লেখ করেছি ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইকরিমা বিন আবি জাহাল জিহাদের জন্য বায়াত গ্রহণ করেন। এ বায়াত কিন্তু খেলাফত বা ইমারতে বায়াত ছিল না। এছাড়া সফরে গেলে কাউকে আমীর নিয়োগ করার কথাও হাদীসে আছে। অতএব ইসলামে বিভিন্ন প্রকার বায়াতের অস্তিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে যে ব্যক্তি যে ধরণের বায়াত দাবী করে সেটা ভিন্ন অন্য প্রকারের বায়াত তার ব্যাপারে কিভাবে প্রমাণিত হবে।

এছাড়া বায়াত এক দরণের চুক্তি যা যারা বায়াত দিচ্ছে এবং যিনি বায়াত নিচ্ছেন উভয়ের মাঝে সম্পাদিত হয়। এখন উভয় পক্ষ যে ধরণের বায়াতের উপর চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন সেটা ভিন্ন অন্য কোনো বায়াত কিভাবে সাবেত করা সম্ভব? আমি কারো হাতে সফরের জন্য বা জিহাদ করার জন্য বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় ও নির্দিষ্ট কোনো স্থানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বায়াত হলাম পরে এই ব্যক্তিই যদি এই বায়াতের উপর ভিত্তি করে নিজেকে খলীফা দাবী করে তবে সেটা কেমন হবে?

এ বিষয়ে সঠিক নিয়ম হলো যখন খেলাফত না থাকে বা অন্য বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট স্থান বা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আপাতত কারো নিকট বায়াত হওয়া যায় কিন্তু খেলাফত কায়েমের সাথে সাথে এই সকল বায়াত পরিত্যাগ করে খলীফার হাতে বায়াত হওয়া আবশ্যক হয়।

ইমাম আল-জুয়াইনী বলেন,

وَلَكِنْ خَلَا الدَّهْرُ عَنْ إِمَامٍ فِي زَمَنِ فَتْرَةٍ، وَانْفَصَلَ شَطْرٌ مِنَ الْخِطَّةِ عَنْ شَطْرٍ، وَعَزَّ نَصْبُ إِمَامٍ وَاحِدٍ، يَشْمَلُ رَأْيُهُ الْبِلَادَ وَالْعِبَادَ، فَنُصِبَ أَمِيرٌ فِي أَحَدِ الشَّطْرَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَنُصِبَ أَمِيرٌ فِي الْقُطْرِ الْآخَرِ مَنْصُوبٌ، وَلَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ الْوَاحِدُ عَلَى حُكْمِ الْعُمُومِ، إِذَا كَانَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ،

فَالْحَقُّ الْمُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَيْسَ إِمَامًا، إِذِ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي بِهِ ارْتِبَاطُ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ.

وَلَسْتُ أُنْكِرُ تَجْوِيزَ نَصْبِهِمَا عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ، وَنُفُوذَ أَمْرِهِمَا عَلَى مُوجَبِ الشَّرْعِ، وَلَكِنَّهُ زَمَانٌ خَالٍ عَنِ الْإِمَامِ، .... فَإِنِ اتَّفَقَ نَصْبُ إِمَامٍ، فَحَقٌّ عَلَى الْأَمِيرَيْنِ أَنْ يَسْتَسْلِمَا لَهُ

যদি কোনো যুগে খলীফা না থাকে এবং বিশ্বের এক প্রান্তের সাথে অন্য প্রান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুই অংশের একজন আমীর নিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে যদি প্রয়োজনের তাগিদে এই প্রান্তে একজন এবং অন্য প্রান্তে আরেকজন আমীর নিয়োগ করা হয় এবং দুটি বায়াতের কোনোটি সবার উপর প্রযোজ্য হিসেবে গ্রহণ না করা হয়। তবে এ বিষয়ে অনুসরণীয় হক কথাটি হলো, এদের দুজনের মধ্যে কেউই ইমাম (খলীফা) হিসেবে গণ্য হবেন না। যেহেতু ইমাম (খলীফা) হবে কেবল সে যার দায়িত্ব সমস্ত মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত। এধরণের অবস্থায় প্রয়োজনের তাকিদে বাধ্য হয়ে দুজন (বা তার বেশি) আমীর নিয়োগ করা এবং শরীয়তের নির্দেশ মত তাদের আনুগত্য করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু এটা ইমাম (খলীফা) বিহীন অবস্থা (যেহেতু দুজনের কেউ খলীফা নয়)। এরপর যদি ইমাম (খলীফা) নিয়োগ করা সম্ভব হয় তবে উভয় আমীররের জন্য উক্ত খলীফার আনুগত্য করা আবশ্যক হবে। [গিয়াছুল উমাম]

অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী একজন খলীফার অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে প্রয়োজনের তাগিদে স্থানীয় আমীরের নিকট বায়াত হওয়া যায়। কিন্তু যখন খেলাফত কায়েম হয়ে যাবে তখন এ ধরণের সকল আমীরের উপর উক্ত খলীফার নিকট বায়াত হওয়া আবশ্যক হবে। তাদের ইমারত ও বায়াত অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। এ ধরণের স্থানীয় বায়াতের অজুহাতে খেলাফত থেকে দূরে থেকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করা বৈধ হবে না।

হুবহু এই কথাটিই কিন্তু আল-আদনানী ঘোষণা করেছেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা শিরোনামে প্রকাশিত বক্তব্যে খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি সকল দল ও সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন,

فاعلموا أنه بعد هذا التمكين وقيام الخلافة: بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بالله :أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة

জেনে নাও, এই খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে তোমাদের সকল দল ও

সংগঠনের গহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই খলীফার নিকট বায়াত না হয়ে এক রাতও অতিবাহিত করা বৈধ নয়।

আয়মান আজ-জাওয়াহেরী এবং তার অনুসারীরা এই ঘোষণায় খুব রাগান্বিত হয়েছেন। ইসলামী বসন্তের বিভিন্ন পর্বে তিনি অন্য সকল দল ও সংগঠনকে বাতিল করে দেওয়ার এই ঘোষণাটিকে নিন্দা করেছেন। এটাকে তিনি মুজাহিদদের মধ্যে (شق الصف) বিভক্তি সৃষ্টি করা হিসেবে গণ্য করেছেন। দাওলাতে ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের দল ও সংগঠন পরিত্যাগ করে খলীফার হাতে বায়াত হতে উৎসাহিত করছে এ বিষয়টি উল্লেখ করে বিভিন্নভাবে তার উপর নিন্দা জ্ঞাপন করার পর আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

هذا لا يجوزُ للخليفةِ الشرعيِ الذي اختاره المسلمون برضاهم واتفاقِهم،

এধরনের কাজ (বিভিন্ন সংগঠনের মুজাহিদদের নিকট বায়াতের দাবী করা) মুসলিমদের পরামর্শ ও ঐক্যমতের মাধ্যমে নিযুক্ত একজন বৈধ খলীফার জন্যও জায়েজ নয়। [ইসলামী বসন্ত পর্ব-০১]

তিনি এটা ভুলে গেছেন যে খেলাফতের ঘোষণা দেওয়াই হয় অন্য সকল দল বা সংগঠনকে বিলুপ্ত করার জন্য। খেলাফত যদি অন্য সকল দল বা সংগঠনকে বাতিল নাই করে এবং তাদের সদস্যদের খলীফার হাতে বায়াত হতে উৎসাহিত নাই করে তবে সেটা খেলাফত কিভাবে হবে?

প্রশ্ন হলো, আইমান আজ-জাওয়াহেরী এবং তার অনুসারীরা যে খেলাফত কায়েম করতে চান সেখানে কি বিভিন্ন দল বা সংগঠনকে পৃথকভাবে টিকে থাকার সুযোগ দেওয়া হবে? অর্থাৎ খলীফা থাকবেন নামকে ওয়াস্তে আর অন্য সব দল ও সংগঠন নিজেদের মনমতো স্বাধীনভাবে কাজ করতে থাকবে? তাহলে তো এই খেলাফত নিজেই একটা জাহালত হিসেবে গণ্য হবে। খেলাফতের নামে এ ধরণের তামাশা করা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রই চাই।

আবু বকর আল বাগদাদী কি খলীফা হওয়ার যোগ্য?

ইসলামী বসন্তের প্রথম পর্বে আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

ولا نرى أبا بكرٍ البغداديَ أهلًا للخلافة

আমরা আবু বকর আল-বাগদাদীকে খলীফা হওয়ার যোগ্য মনে করি না।

এখানেও তিনি একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। কেবল বলে দিয়েছেন, আমরা তাকে যোগ্য মনে করি না। কিন্তু কেনো যোগ্য মনে করেন না বা তার মধ্যে খলীফার কোন গুণটার অভাব আছে যেগুলো অর্জন করলে তিনি খেলাফতের যোগ্য হতেন সে বিষয়ে কিছুই বলেন নি। সুতরাং এটাও আজ-জাওয়াহেরীর একটা রাজনৈতিক বক্তব্য।

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামায়া বলেন, খলীফার দশটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। তা হলো,

(১) খলীফা পুরুষ হবে (২) স্বাধীন হবে (৩) বালেগ হবে (৪) বুদ্ধি সম্পন্ন হবে (৫) মুসলিম হবে (৬) ন্যায়বান হবে (৭) সাহসী হবে (৮) কুরাইশী হবে (৯) আলিম হবে (১০) উম্মাতকে পরিচালনা করার যে দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। [গিয়াছুল উমাম]

সুতরাং খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া, আলেম হওয়া, রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে দক্ষ হওয়া, ন্যায়বান হওয়া ইত্যাদি বিষয় শর্ত। এসব দিক থেকে আবু বকর আল-বাগদাদী যে যোগ্য তার স্বীকৃতি কিন্তু আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর পূর্বের কথার মধ্যেই রয়েছে।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এবং আল-জুলানী আবু বকর আল-বাগদাদীর যেসব প্রশংসা করেছেন সেগুলো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সম্মানিত শায়েখ, হাসান رضي الله عنه এর দৌহিত্র, নামের শেষে হাফিজাহুল্লাহ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। প্রশ্ন হলো, কোনো জালিম শাসককে এভাবে প্রশংসা করা যায় কি?

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। আজ-জাওয়াহেরী বারবার দাবী করছেন ৯ ই জুন ২০১৩ ইং তারিখে দাওলাত এবং জাবহাতুন নুসরার মধ্যে মিমাংসা করা এবং দাওলাতের পক্ষ থেকে তা মানতে অস্বীকার করার আগ পর্যন্ত তিনিই আবু বকর আল-বাগদাদীর আমীর। এমন কি উক্ত ফয়সালাতেও এক বছরের জন্য আবু বকর আল বাগদাদীকে ইরাকের আমীর পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত তিনি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তার দাবী অনুযায়ী ইরাকের দাওলাতে ইসলামের নেতৃত্বে আবু বকর আল-বাগদাদীকে এ যাবতকাল তিনিই বহাল রেখেছেন এবং শেষ সিদ্ধান্তেও আরও এক বছর কাল বহাল রাখতে চেয়েছেন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, একজন ব্যক্তির খলীফা হওয়ার জন্য যত গুণাবলী দরকার কেবল কুরাইশ হওয়া ছাড়া বাকি সব গুণাবলী যেমন ন্যায়বান হওয়া, যুদ্ধ কৌশলে

পারদর্শী হওয়া, সাহসী হওয়া, জ্ঞানী হওয়া, সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের লোক হওয়া ইত্যাদি বিষয় কিন্তু স্থানীয় আমীরের মধ্যেও থাকা উচিৎ।

ইসলামী বষন্তের তৃতীয় পর্বে আজ-জাওয়াহেরী বলেন,

وهذه العدالةُ شرطٌ في كلِ ولايةٍ شرعيةٍ، ولذا فهي شرطٌ في أهلِ الحَلِ والعقدِ، وفيمن يُرشحُ للخلافةِ، فمن كان مجهولًا أو مجروحًا في عدالتِه فلا يصلحُ لأيةِ ولايةٍ شرعيةٍ، وبالأحرى لا يصلحُ لأن يكونَ من أهلِ الحَلِ والعقدِ ناهيك عن أن يكونَ خليفةً

ন্যয়পরায়নতা যে কোনো শারয়ী দায়ীত্বের ক্ষেত্রে শর্ত। আহলে হাল ওয়াল আক্বদ (মুসলিমদের নেতৃস্থানীয়) হওয়া অথবা খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়া ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। যে ব্যক্তি অজ্ঞাত অথবা তার ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারে আপত্তি আছে এমন ব্যক্তি শরীয়তের কোনো পদই পাওয়ার যোগ্য নয় অতএব আহলে হাল ওয়াল আক্বদ বা খলীফা হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

সুতরাং আবু বকর আল-বাগাদাদী অজ্ঞাত বা বিভ্রান্ত লোক হলে তাকে কেবল খলীফা নয় বরং ইরাকের দাওলাতে ইসলামে আমীর নিয়োগ করাও উচিৎ নয়। কিন্তু আজ-জাওয়াহেরীর দাবী অনুযায়ী এ যাবাতকাল তিনিই আবু বকর আল-বাগদাদীর আমীর। অর্থাৎ তার নির্দেশেই আবু বকর আল-বাগদাদী ইরাকের দাওলাতে ইসলামের আমীর হিসেবে বহাল ছিলেন। এ দাবী সত্য নয় তবে তিনি যে মিমাংসার সময় তাকে এক বছরের জন্য ইরাকের আমীর রাখতে চেয়েছেন এটা কিন্তু সত্য।

প্রশ্ন হলো, আজ-জাওয়াহেরী কি তবে একজন জালিম, অজ্ঞ বা বিভ্রান্ত লোককে ইরাকের আমীর নিয়োগ করেছেন? নিশ্চয় তা নয় বরং তার নিকট একজন আমীরের মধ্যে যেসব গুণাবলী দরকার আবু বকর আল-বাগদাদীর মধ্যে সেগুলো আছে এমন মনে হয়েছে বলেই তাকে তিনি ইরাকের আমীর পদে বহাল রাখতে চেয়েছেন।

এখন বাকী থাকে কেবল বংশগত পরিচয় তথা কুরাইশ হওয়ার বিষয়টি। আজ-জাওয়াহেরী নিজে মুখেই কিন্তু খলীফার বংশ পরিচয়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন। পূর্বের বক্তব্যসমূহতে তিনি যখনই আবু বকর আল-বাগদাদীর নাম উল্লেখ করেছেন তখনই আল-হুসাইনী (হুসাইনের বংশধর) এই কথাটি যোগ করেছেন। তাছাড়া শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরাক্ষার জন্য একটি সাক্ষ্য শিরোনামে দেওয়া বক্তব্যে তিনি খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীকে তার দাদা হাসান ﵁ এর অনুসরণ করে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে ইরাকে ফিরে যেতে উৎসাহিত করেছেন। এরপর তিনি বলেন,

توكلْ على اللهِ، واتخذْ هذا القرارَ، وستجدُ كلَ إخوانِك المجاهدين وكلَ أنصارِ الجهادِ أعوانًا لك وسندًا ومددًا. أيها الشيخُ المكرمُ اقتدِ بجدِك، وكن خيرَ خلفٍ لخيرِ سلفٍ. وأعدْ مأثرةً من مآثرِ بيتِ النبوةِ، تفزْ في الدنيا والآخرةِ بتوفيقِ

اللهِ

আল্লাহর উপর ভরসা করে এই সিদ্ধান্ত (ইরাকে ফিরে যাওয়া) গ্রহণ করুন তাহলে আপনার মুজাহিদ ভাইয়েরা আপনার সহযোগিতা করবে এবং আপনাকে সমর্থন করবে। ওহে সম্মানিত শায়েখ আপনার দাদাকে (হাসান ﷺ কে) অনুসরণ করুন এবং উত্তম পূর্বপুরুষের উত্তম উত্তরাধিকার হোন। নবী পরিবারের এই ঐতিহ্য আবার বাস্তবে পরিণত করুন। তাহলে আপনি আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবেন।

এই কথাটি তিনি বলেছেন ২-৫-২০১৪ ইং তারিখে অর্থাৎ শামে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা, জাবহাতুন নুসরার সাথে বিরোধ, আজ-জাওয়াহেরীর মিমাংসা, দাওলাতের পক্ষ থেকে তা মানতে অস্বীকার করা ইত্যাদি সকল ঘটনার বছর খানেক পরে। এখানে তিনি আবু বকর আল-বাগদাদীর প্রশংসা করেছেন এবং তিনি যে নবী বংশের সেটার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে পূর্বের যত ঘটনা ঘটেছে সেসব সত্ত্বেও আবু বকর আল-বাগদাদীর যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আজ-জাওয়াহেরী তুলতে পারেন নি। যেহেতু তিনি তাকে ইরাকে ফিরে গিয়ে সেখানে শাসন করতে অনুরোধ করছেন। অর্থাৎ তখনও তিনি আশা করছিলেন হয়তো তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ইরাকে ফেরত পাঠানো যাবে। এভাবে আজ-জাওয়াহেরী শামের ভূমিকে আল-কায়েদার প্রভাব ধরে রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন আবু বকর আল বাগদাদীকে খলীফা নির্ধারন করে খেলাফতের ঘোষণা দেওয়া হলো তখন সে আশা শেষ হয়ে গেলো। তখন থেকে তিনি খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর নামে অপবাদ রটতে শুরু করলেন। তার যোগ্যতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, ভ্রান্তি ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। এখানে মূল সমস্যা কিন্তু ইরাকে ফিরে যাওয়া নিয়ে আবু বকর আল-বাগদাদীর যোগ্যতা নিয়ে নয়।

আল-আদনানী কত সুন্দরই বলেছেন,

إئذا بقينا في الشام كُنّا من الخوارج ...... وإذا انسحبنا للعراق مستسلمين هاربين صرنا على السنّة أحفاد الحسين مُجاهدين

যদি আমরা শামে থাকি তবে আমরা খারেজী, আর যখন আমরা কাপুরুষের মতো পালিয়ে শাম ছেড়ে ইরাকে ফিরে যাবো তখন আমরা সুন্নী এবং হুসাইনের বংশধর হয়ে যাবো?

[দুঃখিত হে আল-কায়েদার আমীর শিরোনামে প্রকাশিত বক্তব্য]

মোট কথা সাধারন নেতৃত্বের যোগ্যতা যে আবু বকর আল-বাগদাদীর আছে সেটা তো ২০১০ সাল থেকে দাওলাতে ইসলামের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন। এখন

খলীফা হওয়ার জন্য অতিরিক্ত যে যোগ্যতাটি প্রয়োজন আর তা হলো কুরাইশ হওয়া সেটিও যে তার আছে তা স্বয়ং আয়মান আজ-জাওয়াহেরীর মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত। এরপরও তিনি খেলাফতের যোগ্য নন এমন মন্তব্য করা এবং বিশ্বব্যাপী খেলাফত কায়েমের জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায় এমন একজন অকুরাইশী ব্যক্তির নিকট বায়াত হওয়া মতিভ্রম নয় কি?

খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদী কি খারেজী বা জালিম?

বাতিলপন্থীদের সর্বশেষ অস্ত্র হলো, হকপন্থীদের ব্যক্তিগত আমল-আক্বীদা বা আখলাক চরিত্রের উপর আঘাত করা। প্রথমেই তারা চেষ্টা করে বিকৃত দলীল-প্রমাণ উত্থাপন করে হককে বাতিল প্রমাণ করার কিন্তু সেটা সম্ভব না হলে যারা হকপন্থী তাদের ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। মুজাহিদদে ব্যাপারে কাফির-মুশরিক এবং তাদের অনুসারী মুসলিম নামধারী মুনাফিক ওলামা-মাশায়েখরা কিন্তু একই কৌশলই অবলম্বন করে। প্রথমে তারা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস পেশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে ইসলামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত বৈধ নয়। কিন্তু এ কথার বিপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ থাকায় সেটা সম্ভব হয় না তাই শেষ পর্যন্ত যারা জিহাদ করে তারা তাদের উপর নানা রকম অপবাদ দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। মুজাহিদদরা রক্তপিপাসু, বিনাবিচারে মানুষ হত্যা করে, মুসলমানদের তাকফীর করে, তারা আসলে কাফিরদের চর জিহাদের নামে মুসলিমদের দেশসমূহ ধ্বংস করতে চায় ইত্যাদি অপবাদ আমরা বহু শুনেছি। বোকা লোকেরা এসব কথা শুনে ধোঁকায় পড়ে মুজাহিদদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে এবং কাফিরদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের নিন্দা করে কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রই এসব কথার অসত্যতা অনুধাবন করে। তারা এসব অপবাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করে না।

কাফির-মুশরিকরা এবং তাদের অনুসারী মুনাফিক ওলামা-মাশায়েখরা যে এমন কাজ করতে পারে সেটা স্বাভাবিক কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজ দাওলাতে ইসলামের মুজাহিদদের ব্যাপারে খোদ আল-কায়েদা ও তালেবানদের অনুসারী মুজাহিদরা অনুরুপ মিথ্যাচার করতে শুরু করেছে। উপরে যেসব কথা বলা হলো সেসব তো বটেই সেই সাথে শত-সহস্র মিথ্যা অপবাদ তারা এখন দাওলাতে ইসলামের ব্যাপারে রটিয়ে থাকেন।

তাদের কিছু মিথ্যা অপপ্রচারের উদাহরণ আমরা উপরে দেখেছি। দাওলাতে ইসলাম আল-কায়েদার নিকট এবং মোল্লাহ উমরের নিকট বায়াত, মৃত মোল্লা উমরকে আড়াই

বছর জীবত রাখা এবং তার নামে জাল বার্তা প্রকাশ করে উম্মতকে ধোঁকা দেওয়া, খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীকে খেলাফতের অযগ্য ঘোষণা করা, খেলাফত তো দূরের কথা দাওলাতে ইসলামকে দাওলাত হিসেবেই মেনে নিতে অস্বীকার করা ইত্যাদি বক্তব্য আমরা উল্লেখ করেছি। সেই সাথে তাদের নিজেদের বক্তব্য থেকে এসব বক্তব্যেকে আমরা মিথ্যা প্রমাণ করেছি। সুতরাং দাওলাতে ইসলামের ব্যাপারে তাদের মিথ্যাচার নতুন নয়। এসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে তারা শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে দাওলাতে ইসলামের খেলাফতকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি তারা সেটা করতে ব্যার্থ হয়েছেন।

তাই এখন তারা বর্তমান খলীফা এবং তার সৈন্যদের ব্যক্তিগত আখলাক-চরিত্র নিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করেছেন। সিরিয়ার বিভিন্ন জিহাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং মুজাহিদদের হত্যা করা, সাধারন মুসলিমদের হত্যা করা এবং তাদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা ইত্যাদি ভয়ংকর সব অপবাদ এখন দাওলাতে ইসলামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি তাদের প্রকাশ্যে খারেজী হিসেবে সম্মোধন করা হচ্ছে।

ইসলামী বসন্তের বিভিন্ন পর্বে আজ-জাওয়াহেরী আকারে-ইঙ্গিতে দাওলাতে ইসলামের উপর মুসলিমদের রক্ত ঝরানো এবং তাদের তাকফির করার অপবাদ আরোপ করেছেন।

আল-জাজিরাতে প্রকাশিত বিলা-হুদুদ নামক অনুষ্ঠানে আল-জূলানীর সাক্ষাতকারের দ্বিতীয় দিন ১৩ জুন ২০১৫ ইং তারিখে দাওলাতে ইসলাম সম্পর্কে আল-জূলানী প্রথমে বলেন, আমরা এতদিন তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা হতে বিরত ছিলাম। যেহেতু আমরা তাদের বিরোধী পক্ষ তাই তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা সঠিক মনে করি নি। এরপর তিনি বলেন,

فالعلماء راقبوا وشاهدو تصريحاتهم وأفعالهم وبعض هؤلاء العلماء مما نثق بدينهم ونثق بعلمهم أصدروا فتاوى بأنهم جماعه أصبحوا من الخوارج ونحنُ ملتزمون بهذه الفتوى

পরবর্তীতে আলেমগণ তাদের অবস্থা ও বক্তব্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঐ সকল আলেম ওলামা যাদের দ্বীন ও জ্ঞানের ব্যাপারে আমরা আস্থা রাখি। তারা বলেছেন, এরা খারেজীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আমরা এই ফতোয়াটি মেনে চলি।

এরপর খারেজী মতবাদ কি এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

يعني هوا مذهب الخوارج الأصل فيه من يكفرون الناس بالذنوب هذا الأصل فيه لكن هناك سمات عامه هو استباحة دماء المسلمين فهذه صفه من صفات الخوارج تكفير المسلمين دون ضوابط شرعية تكفير الخصوم

খারেজীদের মাজহাবের মূল কথা হলো, পাপী মুসলিমকে কাফির বলা। কিন্তু এখানে কিছু সাধারন বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, মুসলিমদের রক্ত বৈধ জ্ঞান করা। এটাই হলো, খারেজীদের বৈশিষ্ট্য আর তা হলো, শারয়তের মূলনীতি ছাড়াই সাধারন মুসলিমদের বা বিরোধী পক্ষকে তাকফীর করা।

এধরণের আরও অনেক অপবাদ বিরোধী পক্ষের লোকেরা খেলাফতের বাহিনীর উপর আরোপ করে থাকে। আল-আদনানী তার বিভিন্ন বক্তব্যে এসব অপবাদ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার অস্বীকৃতির দিকে কেউ কর্ণপাত করেনি। বরং সকলে চোখ-কান বুজে কেবল অপবাদ দিয়ে গেছে। দাওলাতে ইসলামকে এরকম অন্ধভাবে অপবাদ দেওয়ার ঘটনা আমরা পূর্বেও দেখেছি। আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয় নেতারা এবং তাদের নিকট অনুসরণীয় কিছু জিহাদী আলেম এসব অপবাদ রটনা করেছেন। যারা তাদের অন্ধ অনুসারী তারা এসব অপবাদকে চোখ বুজে মেনে নিয়ে দাওলাতে ইসলামকে দোষারোপ করেন এবং এসব মিথ্যা আপত্তি-অভিযোগ চতুর্দিকে প্রচার করেন।

এখানে পাঠককে আমি স্মরণ করিয়ে দেবো গ্রন্থের শুরুতেই আমরা এই মূলনীতি গ্রহণ করেছি যে আমরা উভয় পক্ষের মতামতের আলোকে সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো। এ মূলনীতির উপর নির্ভর করে আমরা এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি সে বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরেছি।

এখানেও আমাদের একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কোনো এক পক্ষের কথা শুনে অন্যায়ভাবে আরেকপক্ষকে দোষারোপ করা আমাদের জন্য অবশ্যই অনুচিত হবে। বরং উভয়পক্ষের বক্তব্যের আলোকে আমাদের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

দাওলাতে ইসলামের মুজাহিদরা জালিম বা খারেজী কিনা সেটা জানতে হলে কেবল বিরোধী পক্ষের কথার উপর নির্ভর করলে হবে না। ইরাক-সিরিয়ার ময়দান থেকে বহু দূরে অবস্থিত কোনো গবেষকের মন্তব্য থেকেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। বরং উভয়পক্ষের মতামত এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোনো নিরপেক্ষ ও ন্যায়বান ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রকৃত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

বেশ কয়েকজন সাংবাদিক যারা অনুমতি গ্রহণ করে বা গোপনে সীমান্ত পার হয়ে দাওলাতে ইসলামের এলাকায় গিয়ে প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে। তারা দাওলাতে ইসলামের ব্যাপারে উত্তম সাক্ষ্য দিয়েছে। এই সকল ব্যক্তিরা জিহাদ ও মুজাহিদদের কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ হিসেবে তাদের নিরোপেক্ষ বলা যায়। কিন্তু এই

গ্রন্থে তাদের মতামত উল্লেখ করা আমরা যথার্থ মনে করছি না। যেহেতু বিরোধী পক্ষ বলতে পারেন আমরা তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করি না। তাছাড়া আমরা গ্রন্থের শুরুতেই বলেছি কেবলমাত্র উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতেই এই গ্রন্থে আলোচনা করা হবে।

মোট কথা, উভয়পক্ষের দাবী এবং পাল্টাদাবীর মধ্যে নিরোপেক্ষভাবে গবেষণা করে প্রকৃত সত্যটি কি সেটা আমাদের উপলব্ধী করতে হবে।

এখানে প্রথমেই পাঠককে যে বিষয়টি লক্ষ্য করতে বলব তা হলো, খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীকে এখন যারা তিরষ্কার করছেন তারাই নিকট অতীতে তারা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ বিষয়ে আল-জূলানী এবং তার আমীর আজ-জাওয়াহেরীর বিভিন্ন বক্তব্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ইরাকে ফিরে না যাওয়ার কারণে এবং খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার কারণে এখন তারা দাওলাতে ইসলামকে কঠিন কঠিন অপবাদ দিচ্ছেন। তাদের জালিম ও খারেজী প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। একারণে আল-আদনানী বলেন,

إئذا بقينا في الشام كُنّا من الخوارج ...... وإذا انسحبنا للعراق مستسلمين هاربين صرنا على السنّة أحفاد الحسين مُجاهدين

যদি আমরা শামে থাকি তবে আমরা খারেজী, আর যখন আমরা কাপুরুষের মতো পালিয়ে শাম ছেড়ে ইরাকে ফিরে যাবো তখন আমরা সুন্নী এবং হুসাইনের বংশধর হয়ে যাবো? [দুঃখিত হে আল-কায়েদার আমীর শিরোনামে প্রকাশিত বক্তব্য]

ঘটনার পরস্পরা সম্পর্কে অবগত এবং নিরপেক্ষ যে কারও নিকট আদনানীর এ কথার সুস্পষ্ট সত্য বলেই প্রমাণিত হবে।

এখনও যদি খলীফা আবু বকর খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করে ইরাকে ফিরে যান তবে তিনি আবারও আজ-জাওয়াহেরীর নিকট উত্তম মানুষে পরিণত হবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদী যদি একজন জালিম ও খারেজী হয়ে থাকেন তবে ইরাকের লোকদের উপরই বা তাকে শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেওয়াটা কিভাবে বৈধ হয়। নাকি ইরাকের মুসলিমদের উপর আজ-জাওয়াহেরীর কোনো রাগ আছে যে কারণে তিনি তাদের উপর জালিম শাসক নিয়োগ করে শাস্তি দিতে চান।?

এখানে পাঠককে স্মরণ রাখতে হবে যে, খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদী সম্পর্কে যারা নানা রকম অপবাদ দিচ্ছেন তারা তার বিরোধী পক্ষ আর নিয়োম হলো কারো ব্যাপারে তার বিরোধী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যদিও সে ন্যায়বান হয় অথচ খলীফার ব্যাপারে যারা অপবাদ দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের মিথ্যাচার প্রমাণিত

হয়েছে। দাওলাতে ইসলামের নামে মিথ্যা বায়াতের দাবী, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দাবী করে তার নামে জাল পত্র প্রকাশ করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট মিথ্যাচারে তারা লিপ্ত হয়েছেন। এমনকি দাওলাতে ইসলামের মুজাহিদদের ব্যাপারে তারা নিজেরাই অতি উত্তম সাক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু বিরোধের সময় উল্টো কথা বলছেন। অতএব পাঠককে চিন্তা করতে হবে, এধরণের লোকের কথার উপর নির্ভর করে খেলাফতকে অস্বীকার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর নিকট প্রথম বায়াত হয় ইরাক ও সিরিয়ার দাওলাতে ইসলামের অনুসারী মুজাহিদরা। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক শক্তিশালী জিহাদী সংগঠন এবং অনেক প্রশিদ্ধ মুজাহিদ দাওলাতে ইসলামকে বায়াত দেন। খেলাফতের ঘোষণার পর ধীরে ধীরে সাইনার মুজাহিদরা, নাইজেরিয়ার বোকো হারাম, কোকাজের মুজাহিদরা, পাকিস্থানের তেহরিকে তালেবানের একটি অংশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অন্যান্য মুজাহিদরা খলীফার নিকট বায়াত হয়েছেন। এরা কেউ কিন্তু খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর নিজের লোক নয়। বরং তারা কেউ তো পূর্বে আজ-জাওয়াহেরীর অনুসারী ছিলেন আর কেউ অনুসারী না হলেও তার ভক্ত ছিলেন। কিন্তু নিরোপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে খেলাফতের দাবী গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে বলেই তারা খলীফার নিকট বায়াত হয়েছেন। এসব মুজাহিদদের আমরা তৃতীয়পক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। যেহেতু তারা খলীফা আবু বকরের হাতে বায়াত হওয়ার সময় অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পরে খেলাফতের ঘোষণা দেওয়া হলে দ্বীনী দায়িত্ব হিসেবে খলীফার হাতে বায়াত হয়েছেন।

এভাবে বিশ্বের প্রতি প্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত যেসব মুজাহিদ খেলাফতের ডাকে সাড়া দিয়ে খলীফার নিকট বায়াত হচ্ছেন তারা কেউই বায়াতের আগে খলীফার দলের লোক ছিলেন না। বরং হয়তো বিরোধী পক্ষের লোক ছিলেন নয়তো নিরোপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু খেলাফতের ঘোষনা আসার পর যখন বুঝতে পেরেছেন এটা বৈধ খলীফা এবং তার হাতে বায়াত না হলে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হবে তখনই তারা বায়াত হয়েছেন। আজ-জাওয়াহেরী এবং তার অন্ধ অনুসারীরা পূর্বে এসব মুজাহিদদের ব্যাপারে অত্যাধিক প্রশংসা করেছেন। এখন খলীফার হাতে বায়াত হওয়ার পর তারা এসব মুজাহিদদের ব্যাপারে কি বলবেন? তারা কি আগের মতোই এসব মুজাহিদদের প্রসংশা করবেন নাকি এখন তর্কের খাতিরে তাদের নিন্দা-মন্দ শুরু করবেন। যদি এসব মুজাহিদদের প্রশংসা করেন তবে তো তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই খেলাফতের সকল অপবাদ বাতিল প্রমাণিত হবে আর যদি এখন বিতর্কের খাতির খলীফা আবু

বকর আল বাগদাদীর হাতে পৃথিবীর যে কেউ বায়াত হয় তাকে খারেজী, জালিম ইত্যাদি বলে গালি দিতে থাকেন তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, তাদের বিরুদ্ধে যেই যাবে সে খারেজী তার আমল-আক্বীদা যাই হোক আর তাদের পক্ষে যারা থাকবে তারা উত্তম লোক যদিও ইরানের সাথে তার সম্পর্ক থাকে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিমান লোক তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকবেন বলে আশা করি।

সর্বোপরি, এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, খলীফা যদি জুলুম করে বা যদি খলীফার মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু থাকে তবু তার আনুগত্য করতে হয়। যতক্ষণ তিনি তার অধীনস্থ ভূমিতে ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এভাবে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ রাখার স্বার্থে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও খলীফার আনুগত্য করতে হয়। বিভিন্ন হাদীসে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, যদি ধরেও নিই খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর আমল-আক্বীদায় কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তবু এর মাধ্যমে তার খেলাফত থেকে দূরে থাকা বৈধ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং খেলাফতের বিরোধী পক্ষের এ বিষয়ে খুব বেশি মাতামাতি করে লাভ নেই।

আলেমরা কি খেলাফতের বিরুদ্ধে?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ যখন শরীয়তের দলীল-প্রমাণের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে তখন বড় বড় আলেম-ওলামা বা পীর মাশায়েখের দোহাই দেয়। বর্তমান যুগে যারা খেলাফতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তারাও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শরীয়তের দলীল প্রমাণের আলোকে তাদের কার্যকলাপ দোষণীয় প্রমাণিত হওয়ার কারণে তারা এখন বেশ বিচলিত। এর মুকাবিলায় তারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। এখন তারা আলেম ওলামাদের দোহায় দিতে শুরু করেছেন।

উপরে আমরা দেখেছি আল-জূলানী বলেন,

فالعلماء راقبوا وشاهدو تصريحاتهم وأفعالهم وبعض هؤلاء العلماء مما نثق بدينهم ونثق بعلمهم أصدروا فتاوى بأنهم جماعه أصبحوا من الخوارج ونحنُ ملتزمون بهذه الفتوى

পরবর্তীতে আলেমগণ তাদের অবস্থা ও বক্তব্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঐ সকল আলেম ওলামা যাদের দ্বীন ও জ্ঞানের ব্যাপারে আমরা আস্থা রাখি। তারা বলেছেন, এরা খারেজীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আমরা এই ফতোয়াটি মেনে চলি।

ইসলামী বসন্তের প্রথম পর্বে আজ-জাওয়াহেরী আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফত অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি খলীফা হওয়ার যোগ্য নন এই মত ব্যক্ত করার পর বলেন,

وهو الأمرُ الذي أكده علماءُ الجهادِ الربانيون الثابتون على الحق ..... كفضيلةِ الشيخِ أبي محمدٍ المقدسيِ وفضيلةِ

সত্যপন্থী আল্লাহ ওয়ালা আলেমরা এ বিষয়ে এ মতই দিয়েছেন। যেমন, সম্মানিত শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদেসী, সম্মানিত শায়েখ আবু কতাদা আল-ফিলিস্তিনী, সম্মানিত শায়েখ হানী আস-সুবায়ী, সম্মানিত শায়েখ তারিক আব্দুল হালীম আল্লাহ তাদের রক্ষা করুন।

দেখা যাচ্ছে আল-জূলানী গ্রহণযোগ্য!! আলেম-ওলামাদের কথা শুনে দাওলাতে ইসলামকে খারেজী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আজ-জাওয়াহেরী এইসব সম্মানিত!! আলেমদের কথা অনুযায়ী খেলাফতকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করছেন। এভাবে তারা একটি সত্যকে অস্বীকার করার জন্য আলেমদের কথাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় তাদের অনুসারীরা খেলাফতের বিরোধী আলেমদের একটা বড় তালিকা বের করে মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। খেলাফতের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রসারে এটাই এখন তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র।

মজার ব্যাপার হলো, এই সকল আলেমের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারা দাওলাতে ইসলামের যেসব ভুল ধরেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি ভুলত্রুটি তাদের মধ্যেই রয়েছে। এখানে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। কেবল সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করবো যাতে পাঠক বুঝতে পারেন কাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে আল-জুলানী এবং তার আমীর আজ-জাওয়াহেরী মুসলিম উম্মাহর খেলাফতকে অস্বীকার করছেন।

সবার আগে যে নামটি উল্লেখ করা হয় সেটা হলো, আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী। আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী এখন খেলাফতের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। আল-কায়েদা ও তালেবান পন্থীরা এটাকে ফলাও করে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আপনি জানেন কি এই ব্যক্তি পূর্বে তালেবানদের ব্যাপারে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন?

১৪২৫ হিজরীতে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর পূর্বে আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসী আবু মুসয়াব আয- যারকাবীর উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ লেখেন। যার নাম (الزرقاوي؛ مناصرة ومناصحة) অর্থাৎ যারকাবীকে কিছু উপদেশ ও সহযোগীতা। এই পত্রটিতে তিনি আবু মুসয়াব আয-যারকাবী এবং তার অনুসারীরা ইরাকে যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন সেগুলোর বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেন। তার আপত্তি অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শহীদী হামলা, সাধারন মুসলিমদের হত্যা করা, বিধর্মীদের উপসনালয় ধ্বংস করা ইত্যাদি। পরবর্তীতে আল-জাজিরাতে একটি সাক্ষাৎকারেও

তিনি এসব বিষয় তুলে ধরেন।

উক্ত প্রবন্ধে আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদেসী আবু মুসয়াব আজ-জারকাবীর সাথে জেলে থাকা কালীন সময়ের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি বলেন,

ثم فرج الله عنا بمنه وكرمه ، فآثرت أنا البقاء في البلد لمتابعة ورعاية الدعوة التي بدأناها ، وكلي أمل أن أنقلها غرباً عبر النهر فلي هناك آمال وطموحات

وآثر أبو مصعب قطع ذلك والسفر إلى أفغانستان ، ولم يكن ذلك ليعجبني خصوصاً مع تحفظاتي آنذاك على الأوضاع هناك ، أما هو فقد كان متحمساً لذلك ويحث كل من يعرف عليه ، وإن يك آلمني العمل على تفريغ الساحة من الشباب الموحد

এরপর আল্লাহ আমাদের উভয়কে মুক্ত করেন। আমি নিজের দেশে অবস্থান করে যে দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেছিলাম মানুষকে সেদিকে দা'ওয়াত দেওয়ার ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দিলাম। আমার আশা ছিল আমি এ দা'ওয়াতকে পশ্চিমে ছড়িয়ে দেবো। ঐ সকল দেশের মানুষদের ব্যাপারে আমার খুবই উচ্চাকাঙ্খা ছিল। কিন্তু আবু মুসয়াব এসব পরিত্যাগ করে আফগানিস্থানে ভ্রমন করে। আমি অবশ্য এটা পছন্দ করি নি যেহেতু সে সময় ওখানকার কিছু পরিবেশ-পরিস্থিতি আমি অপছন্দ করতাম। কিন্তু সে ছিল এ বিষয়ে আবেগী তার পরিচিত যার সাথেই দেখা হতো সে তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতো। তবে আমার নিজের এলাকা তাওহীদপন্থী যুবকরা খালি করে দিয়ে চলে যাবে এটা ভেবে আমি পীড়া অনুভব করতাম।

এরপর তিনি বলেন,

وبلغني أن أبا مصعب ومن معه من الشباب امتنعوا عن القتال مع الطالبان لما عاينوا أشياء كنت أتحفظ بسبب بعضها على الأوضاع هناك ولا أتحمس للسفر الذي تحمس له غيري ، فعاينت تلك الأشياء بعين البصيرة في وقت مبكر دون أن أتجشم تلك المسافات التي قطعوها كي يعاينوها بعين البصر

আমি পরে জানতে পেরেছিলাম, আবু মুসয়াব এবং তার সঙ্গীরা তালেবনের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করেছে যেহেতু তারা তাদের মধ্যে এমন কিছু বিষয় দেখতে পেয়েছে যার কারণে আমি সেখানে গমণ করা হতে বিরত থেকেছি। আমি সেখানে ভ্রমণ করার ব্যাপারে আবেগী হই নি যেমন আবেগী অন্যরা হয়েছিল। আমি এসব বিষয় দূরদৃষ্টির মাধ্যমেই আগে থেকে অনুভব করতে পেরেছিলাম তাই আমার কষ্ট করে সেখানে যাওয়া লাগে নি। আর তারা স্বচক্ষে দেখার পর বুঝতে পেরেছে।

যাই হোক, আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসী এর পর আবু মুসয়াব আয-যারকাবী ও তার সঙ্গীদের বিভিন্ন কার্যকলাপকে অপরিনামদর্শী ও অযৌক্তিক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এমনকি ইরাকে যখন তারা জিহাদ শুরু করেন আমরা জানি বিদয়াত পন্থী ও

অজ্ঞ লোকদের বাদ দিলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তাদের কার্যকলাপকে পছন্দ করে কিন্তু মাকদিসী তাদের কার্যকলাপকে পছন্দ করতে পারেন নি। তিনি এক্ষেত্রেও একই পন্থা অবলম্বন করেন। নিজে তো সেখানে গমণ করার প্রয়োজনীয়তা কখনও অনুভব করেন নি উপরন্তু তার অনুসারী অন্যান্য মুসলিমরা সেখানে গিয়ে জিহাদ করুক এটা তিনি পছন্দ করেন নি। আল জাজিরাকে তিনি যে সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন বলে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তিনি সেখানে বলেন,

ففي هذه المرحلة أنا ما أريد أن تكون يعني العراق أو غير العراق مُحرقة لأبناء هذا التيار، لا تكون محرقة لأن يعني عندنا رصيد من الشباب المسلم

দা'ওয়াতের এই স্তরে আমি চাই না যে, ইরাক বা ইরাক ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলে আমাদের চিন্তাধারার লোকেরা ধ্বংস হোক। আমাদের নিকট অল্পকিছু মুসলিম যুবক রয়েছে ......

দেখা যাচ্ছে, অনেক আগে থেকেই আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদেসী মুসলিম যুবকদের আফগান, ইরাক এবং বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে জিহাদে যাওয়া থেকে যতদূর সম্ভব বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। এই হলো, আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসীর ভূমিকা। আর এখন তিনি এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। ইসলামী খেলাফতের ব্যাপারে গলা বাড়িয়ে মন্তব্য করছেন আর কিছু লোক সেসব মন্তব্য অনুবাদ করে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না যে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামরত জানবাজ মুজাহিদদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করলে এর ফলে কেবল আল্লাহর শত্রুরাই উপকৃত হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুপথ প্রদর্শন করুন আমীন।

আল-মাকদেসীর সাথে সাথে আবু বছীর আত-তুরতুসীর মতামতও অনেক আল-কায়েদার অনুসারীকে উত্থাপন করতে দেখা যায়। এরা সম্ভবত কোনো ব্যক্তির আগা-মাথা না জেনেই তাকে আলেমের আসনে বসিয়ে ভক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করে। এই আবু বসীর আত-তুরতুসী নিজেকে জিহাদপন্থী আলেম মনে করলেও এ যাবতকাল সে কেবল জিহাদের বিরোধিতায় করে এসেছে। সেই প্রথম দাওলাতে ইসলামকে খারেজী বলে আখ্যায়িত করেছে তারপর দাওলাতে ইসলামের বিরোধীরা এই কথাটিকে বিনা বিচারে গ্রহণ করে প্রচার করে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তি কেবল দাওলাতে ইসলামকে নয় বরং সকল মুজাহিদকেই নিন্দা করেছে। সে আল-কায়েদাকেও নিন্দা করেছে এবং আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে জাবহাতুন নুসরাতে যোগ দেওয়া হারাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। জাবহাতুন নুসরার সাথে যোগ দেওয়া যাবে কিনা এমন একটা প্রশ্নের জবাবে সে বলেছে,

ما دامت جبهة النصرة مرتبطة بحزب أو جماعة القاعدة، وترى نفسها فرع اً للقاعدة في الشام .. لا أنصح ولا أجيز الانضمام إليها

যতদিন পর্যন্ত জাবহাতুন নুসরা নিজেকে আল-কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করবে এবং নিজেকে শামে আল-কায়েদার শাখা দাবী করবে ততদিন আমি তাতে যোগ দিতে পরামর্শ দেবো না এবং তাতে যোগ দেওয়া বৈধ বলবো না।

পূর্বেও সে মুজাহিদদের ব্যাপারে এধরণের নিন্দা-মন্দ করেছে। শেষে বাধ্য হয়ে আবু মুনযির আশ-শানক্বীতি তার বিরুদ্ধে- (التبصير بحقيقة منهج أبي بصير) তথা আবু বছীরের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত করানো শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি এই ব্যক্তির পূর্বের সব কার্যকলাপ তুলে ধরেন। জাবহাতুন নুসরা সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের ব্যাপারে তার নিন্দা-মন্দের ব্যাপারটিও তিনি উল্লেখ করেন। এক পর্যায়ে বলেন,

من يتابع كتابات أبي بصير يلاحظ أنه دائما يصف المجاهدين وأنصار المجاهدين بأوصاف : "خوارج العصر" و "الغلاة" و "الجهال "

যে কেউ তার লেখা-লেখি মনোযোগ নিয়ে পাঠ করে সে দেখতে পাবে তিনি মুজাহিদদের এবং তাদের সহযোগীদের সর্বদা যুগের খারেজী, কট্টরপন্থী, মুর্খ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেন।

আবু মুনযির আশ-শানক্বীতী কিন্তু আল-কায়েদাপন্থী আলেম। তিনি নিজেই আবু বছীর সম্পর্কে এই ধরণের সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু আল-কায়েদার অনুসারীরা দাওলাতে ইসলামে ব্যাপারে তার ফতোয়া পেয়ে আহলাদে আটখানা হয়ে সেটা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে দাওলাতে ইসলামের ব্যাপারে যে কেউ ফতোয়া দিলেই তারা সেটা প্রচার করেন তার হাল-হাক্বীকত কি তা ভেবে দেখেন না।

এর পরই আসে আবু ক্বতাদা আল-ফিলিস্তিনীর কথা। খেলাফতের ঘোষণায় সম্ভবত তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশি রাগান্বিত হয়েছেন। রাগের চোটে হুশ হারিয়ে তিনি খেলাফতের সৈন্যদের এমনকি জাহান্নামের কুকুর নামে অভিহিত করেছেন। খেলাফতের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে তিনি সে ঘোষণাকে অস্বীকার করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার নাম দিয়েছেন (ثياب الخليفة) খলীফার ছদ্মবেশ। সেখানে তিনি আবু বকর আল-বাগদাদী এবং তার অনুসারীদের ব্যাপারে নানা রকম অপবাদ দিয়েছেন। বইটি লেখা হয়েছে জেলখানায় বসে। বইয়ের ভিতরে তিনি নিজেই কথা প্রসঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এখানে সহজ যে প্রশ্নটি সৃষ্টি হয় তা হলো, জেল খানায় বসে উভয় পক্ষের কতা-বার্তা নিরোপেক্ষভাবে যাচায়-বাছায় করা তার পক্ষে

কিভাবে সম্ভব হলো? এর মাধ্যমে তার সকল মতামত কি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে না? বিশেষ করে যখন দাওলাতে ইসলামের বাহ্যিক অবস্থা তার কথার বিরুদ্ধে মনে হয় তখন তার কথা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ থাকে কি?

তাছাড়া খেলাফতের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণের পরপরই জর্দানের তাগুতী সরকার তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়। সে সময় অনেক বিশ্লেষকই মনে করেছেন দাওলাতে ইসলামের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণের কারণেই তাকে মুক্ত করা হয়েছে। এই ধরণের একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে!

আর এক জোড়া লেখক রয়েছেন যারা একত্রে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে লেখা-লেখি করেছেন। তারা হলেন তারিক আব্দুল হালিম এবং হানি আস-সুবায়ী। তাদের মতামতও আল-কায়েদার লোকেরা গুরুত্বসহকারে উপস্থাপণ করে থাকেন।

এদের মধ্যে প্রথম জন কানাডাতে থাকেন আর পরের জন থাকেন ইংল্যান্ডে। এ নিয়ে তাদের ব্যাপারে অনেকে অনেকে বিরুপ মন্তব্য করেছেন। জিহাদের পক্ষে কথা বলে কিভাবে মুজাহিদদের শত্রুদের দেশে বসবাস করেন সেটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে। বলা বাহুল্য যে, এটা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন।

তবে আজ-জাওয়াহেরী কিন্তু কাফিরদের দেশে বসবাস করার বিষয়টিকে সম্মানের বিষয় বলেই মনে করেছেন। শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরক্ষা শিরোনামে দেওয়া বক্তব্যে আয়মান আজ-জাওয়াহেরী হানী আস-সুবায়ীকে (المهاجر الصادع بالحق) প্রকাশ্যে সত্যের প্রচারক এবং মুহাজির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা দুটি নতুন বিষয় জানতে পারি। প্রথমত: দারুল কুফরে আশ্রয়গ্রহণকারীকেও মুজাহির বলা যায় আর দ্বিতীয়ত কাফিরদের রাষ্ট্রে বসেও প্রকাশ্যে হক্কের প্রচার করে নিরাপদে জীবন যাপন করা যায়। অর্থাৎ যারা নিরাপদে হক্কের প্রচার করতে চায় তাদের উচিৎ ইংল্যান্ডে হিজরত করা। আয়মান আজ-জাওয়াহেরী নিজে এটা কেনো করেন না সেটাই এখন প্রশ্নের ব্যাপার।

যাই হোক, এই লেখকদ্বয় কাফিরদের রাষ্ট্রে বসে মুজাহিদদের বিষয়ে যথেষ্ট নাক গলিয়েছেন। অথচ তারা নিজেরাই বলেছেন যে তারা আল-কায়েদা বা অন্য কোনো জিহাদী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত নন। ইসলামী খেলাফতের বিপরীতে তারা একত্রে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যার নাম (ليحي من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة) ‘‘তথা যে মুক্তি পেতে চায় সে জেনে বুঝে মুক্তি পাক আর যে ধ্বংস হতে চায় সে জেনে বুঝে ধ্বংস হোক’’। এর ভূমিকাতেই তারা বলেন,

نقول وبالله التوفيق نحن الموقعون أدناه لاننتمي إلى أية تنظيم كجماعة الدولة أو القاعدة أو النصرة أو أحرار الشام أو

غيرهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

আমরা যারা এই প্রবন্ধের নিচে স্বাক্ষর করেছি (লেখক দ্বয়) দাওলাতে ইসলাম, আল-কায়েদা, জাবহাতুন নুসরা, আহরার আশ-শাম বা অন্য কোনো সংগঠনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নই।

প্রশ্ন হলো, আমরা কোনো জিহাদী সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নই কথাটা এত গর্বের সাথে বলার কি আছে? এতে তো তাদের লজ্জা পাওয়া উচিৎ। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে জিহাদ করে না জিহাদের নিয়তও অন্তরে রাখে না তার মৃত্যু হয় জাহেলীয়াতের মৃত্যু। এনারা কোনো দলের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবেও যুক্ত নন আবার পরোক্ষভাবেও যুক্ত নন। এমন খাপ ছাড়া আচরণ করার কারণ কি?

দাওলাতে ইসলাম ভাল না লাগলে জাবহাতুন নুসরা, সেটা ভাল না লাগলে আহরার আশ-শাম যে কোনো একটা দলের অধীনে থেকে বা যে কোনো একটা দলকে সমর্থন করতে তাদের সমস্যটা কোথায়? নাকি তাদের দৃষ্টিতে সব দলে মধ্যেই কোনো না কোনো সমস্যা আছে। তাহলে সেগুলো গোপন করে কেবল দাওলাতে ইসলামের পিছনে কেনো লেগেছেন? কেউ হয়তো বলবে কাফিরদের দেশে থেকে কি হকপন্থী জিহাদী দলের সমর্থন করা যায়!

এটা কিন্তু সঠিক কথা। কাফিরদের দেশে থেকে হকপন্থী মুজাহিদদের সমর্থন করা যায় না বরং তাদের নিন্দা করতে হয়। তাই তো তাদের নিন্দা ও তিরষ্কার শুনে আবারও মনে হচ্ছে দাওলাতে ইসলামই হকপন্থী।

আমাদের কথা হলো, হক-বাতিল নির্ণয় করতে হবে কুরআন-সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে। কাফিরদের দেশে থেকে বা কাফিরদের জেলে বন্দি থেকে কেউ একটা মন্তব্য করবে আর সেটা কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও ফলাও করে প্রচার করে বেড়াতে হবে এটা সঠিক নীতি নয়।

এদের বিপরীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হকপন্থী আলেম-ওলামাদের একটি বিরাট অংশ দাওলাতে ইসলামের পক্ষাবলম্বন করেছেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে তাদের সবাই নিজের নাম পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু কিছু আলেম প্রকাশ্যে দাওলাতে ইসলামের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সুযোগ পেয়েছেন হিজরত করে দাওলাতে ইসলামে যোগ দিয়েছেন আর যারা সেটা করতে পারেননি তারা নিজ নিজ দেশে অবস্থান করেই দাওলাতে ইসলামের পক্ষে কথা বলেছেন। একারণে তাদের মধ্যে অনেকেই তাগুতের হাতে বন্দী হয়েছেন। কেউ কেউ এখনও মুক্ত আছেন তবে তাদের ব্যাপারে যে কোনো মুহুর্তে কারাগার বরণ

করার আশঙ্কা রয়েছে।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে রিযক আত-তুরহুনী। মিশরে জন্মগ্রহণ করেন, আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাফসীর ও উলুমে কুরআনের উপর ডক্টরেট করেন এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেছেন। কর্মজীবনে মদীনা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটিতে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি একজন লেখক, গবেষক, মুফতী ও দায়ী। প্রায় অর্ধশত বই লিখেছেন। তার মধ্য কিছু ছাপা হয়েছে আর কিছু ছাপার অপেক্ষায় আছে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী সিলসিলাতুস সহীহাতে তার নাম উল্লেখ করে ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। একটি হাদীস সম্পর্কে আলবানী বলেন,

وقد خرجه مع شواهده الكثيرة الأخ الفاضل الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه القيم "موسوعة فضائل سور وآيات القرآن "

এই হাদীসটির বহু সংখ্যক সমর্থক সনদ সম্মানিত ভাই শায়েখ মুহাম্মাদ বিন রিযক তুরহুনী তার মহামূল্যবান গ্রন্থ 'মাওসুয়া-ই ফাদায়েলি সুয়ারি ওয়া আয়াতিল কুরআন' এ উল্লেখ করেছেন।

পূর্বেও তিনি হকের পক্ষে কথা বলেছেন এবং এসব কারণে বেশ কয়েক বছর সৌদি আরবে কারাগারে বন্দি ছিলেন। এখন তিনি মিসরে অবস্থান করছেন। দাওলাতে ইসলামের ব্যাপারে বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহের জবাবে তিনি বক্তব্য দিয়ে থাকেন। দাওলাতে ইসলামের আলেম কারা? এ সম্পর্কে তিনি একটি বক্তব্য দিয়েছেন। সেখানে তিনি দাওলাতে ইসলামের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন আলেম-ওলামাদের নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তাদের কিছু অংশের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো,

১. শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদী অর্থাৎ খলীফা নিজে। যেহেতু তিনি বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয় হতে কুরআনে জ্ঞানের উপর স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং কুরানের কিরাতের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন।

২. শায়েখ শিফা বিন আলী আন-নি'মাহ। মুফতী এবং খতীব। তিনি মুসলে দাওলাতে ইসলামের মুফতী হিসেবে নিয়োজিত। তার পুত্র আব্দুল্লাহ একজন মুফতী। তিনি পিতাকে ফতোয়ার কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

৩. সায়্যেদা ঈমান মুস্তাফা আল-বুগা। সিরিয়ার প্রখ্যাত আলেম মুস্তাফা আল-বুগা এর কন্যা। দামেশকের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিকাহ ও উসুলের উপর ডক্টরেট করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। সৌদি আরবের দাম্মাম বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে

কর্মরত ছিলেন। এই সম্মানজনক পদ, বড় অংকের বেতন ও বিলাশিতা পরিত্যাগ করে তিনি হিজরত করে দাওলাতে ইসলামে গমণ করেছেন এবং খলীফা আবু বকর আল-বাগাদাদীর বায়াত হয়েছেন।

৪. শায়েখ উমর ইবনে আব্দুল খালিক। বয়োবৃদ্ধ আলেম। সুদানের বাসিন্দা। সৌদী আরব ও মিসর সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ওলামা-মাশায়েখদের নিকট কুরআন-হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান হাসিল করেছেন। ফিকহে মুকারান (বিভিন্ন মাযহাবের ফিকাহর উপর তুলনামূলক জ্ঞান) এর উপর মাস্টার ডিগ্রী করেছেন। সুদানের খুরতুমে অবস্থিত ইমাম বুখারী ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক। "কিতাব ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরো" নামক সংগঠনের প্রধান। খেলাফতের ঘোষণার পর পুরা মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা মেনে নেওয়া আবশ্যক বলে ফতোয়া দেন এবং সোমালের জিহাদী সংগঠন আশ-শাবাবকে দাওলাতে ইসলামের সাথে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করেন। একারণে সুদানের তাগুতী সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এখনও পর্যন্ত তিনি বন্দি অবস্থায় আছেন। আল্লাহ তাকে মুক্ত করুন।

৫. শায়েখ মুহাদ্দিস মুসায়িদ ইবনে বাশির। সুদানের বাসিন্দা। সুদানে যে অল্প কয়েকজন মুহাদ্দিস আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম। দাওলাতে ইসলামের পক্ষ নেওয়ার কারণে তিনিও সুদানের তাগুতী সরকারের নিকট বন্দী আছেন। আল্লাহ তাকে মুক্ত করুন।

৬. আব্দুল মাজিদ আল-হাতারী। ইয়ামেনের বাসিন্দা। সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেম-ওলামাদের নিকট জ্ঞান অর্জন করেছেন। তার পুত্র আমেরিকার ড্রোন হামলায় শহীদ হয়েছে। তিনি দাওলাতের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া আরও অনেকে রয়েছেন যাদের নাম-পরিচয় উল্লেখ করলে আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল বিরোধী পক্ষের অপবাদকে খন্ডায়ন করা। যারা বলে দাওলাতে ইসলামের পক্ষে কোনো আলেম নেই। আশা করি এর মাধ্যমে তাদের ভ্রান্তির অপনোদন হবে। আর যদি কেউ মনে করে, মাকদিসি, বা জাওয়াহেরী ছাড়া বিশ্বে আর কোনো আলেম নেই তার কথা অবশ্য ভিন্ন।

শেষ কথা

খলীফা আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফত শরীয়তের মানদন্ডে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তার পূর্বে কোনো ব্যক্তি খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করে নি। বর্তমানেও তিনি ছাড়া আর কোনো খেলাফতের দাবীদার নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদরা তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। যাদের অধীনে তাগুতের সীমানা

প্রাচীরকে উপেক্ষা করে ইরাক, শাম, মিসর, লিবিয়া, কোকাজ, নাইজেরিয়া, খুরাসান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকাতে বিস্তীর্ণ এলাকা আল্লাহর বিধান দ্বারা এক নেতৃত্বে শাসিত হচ্ছে। যারা এই খেলাফত থেকে দূরে রয়েছে তাদের নিকট কোনো বৈধ ওযর নেই। অতএব, কোনো প্রবীণ নেতা বা প্রশিদ্ধ আলেম খেলাফতের বায়াত থেকে দূরে আছে এই অজুহাতে আমিও দূরে থাকবো এটা সঠিক পন্থা নয়। বরং সকল মুসলিমকে খেলাফতের অধীনে একতাবদ্ধ হতে হবে।

যদি কোনো মুসলিম কোনো ব্যাপারে খলীফার মতের সাথে একমত হতে না পারে বা কোনো কারণে খলীফার কোনো কাজকে অপছন্দ করে তবু তার উপর খলীফার আনুগত্য করে যাওয়া আবশ্যক। যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে রসুলুল্লাহ্ ﷺ কঠিন বা সহজ, পছন্দ বা অপছন্দ যে কোনো ব্যাপারে ইমামের নির্দেশ মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। সকল মুসলিম একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হবে এটা সম্ভব নয় এটা শর্তও নয় বরং তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু তাদের নেতা হবে একজন। মুসলিমরা একমত হবে না কিন্তু তাদের একটি মাত্র মাথা হবে এটাকেই বলা হয় খেলাফত। অতএব, খলীফার সাথে কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকলেই খেলাফত থেকে দূরে থাকতে হবে এটা সঠিক নয়। উমর رضي الله عنه যখন খলীফা ছিলেন তিনি গোসল ফরজ থাকলে পানি না পেলেও তায়াম্মুম করার বিরুদ্ধে ছিলেন, তামাত্তু হজ্জ বৈধ মনে করতেন না। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম এসব ব্যাপারে তার সাথে দ্বিমত করেছেন কিন্তু তারা তার খেলাফত থেকে দূরে সরে যান নি। আলী رضي الله عنه যখন খলীফা ছিলেন তখন তিনি কিছু লোককে পুড়িয়ে হত্যা করেন। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এটা শুনে বলেন,

لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»

আমি হলে তাদের পুড়িয়ে ফেলতাম না যেহেতু রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহর শাস্তি দ্বারা (আগুন দ্বারা) কাউকে শাস্তি দেওয়া উচিৎ নয়। [সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস এ হাদীসের কারণে আলী رضي الله عنه এর এ কাজটিকে অপছন্দ করেছেন। এবং এ ব্যাপারে আলী رضي الله عنه এর সাথে দ্বিমত করেছেন কিন্তু এ কারণে তিনি তার খেলাফত থেকে দূরে সরে যান নি। কেননা রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে কেউ তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে যেনো ধৈর্য অবলম্বন করে কেননা যে মুসলিমদের ঐক্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায় এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহেলীয়্যাতের মৃত্যু বরণ করে। [বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে সেগুলোর সমাধান করা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই বিভিন্ন ব্যাপারে দ্বিমত চলে আসছে। পরবর্তীতে ওলামায়ে কিরাম চারটি প্রশিদ্ধ মাজহাবের অনুসরণ করেছেন। যত চেষ্টায় করা হোক এসব বিষয়ে মুসলিমদের একমত করা সম্ভব নয় তাই কোনো যুগেই কোনো খলীফা এ চেষ্টা করেন নি। চার মাজহাবকে বিনাশ করে সকল মানুষকে একটি মত মানতে বাধ্য করা খেলাফতের কাজ নয় বরং সুস্পষ্ট ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে যে যার মত মেনে চলুক কিন্তু এক নেতার আনুগত্য করুক এটাই ইসলামের শিক্ষা। বর্তমান খেলাফতও এ শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছে।

২০১৫ এর জুন মাসে প্রকাশিত “হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহর দ্বীনের দা’য়ীর কথায় সাড়া দাও” (يا قومنا أجيبوا داعي الله) শিরোনামের বক্তব্যে আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী সকল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন,

فالخلافة تجمع جميع المسلمين , تجمع الشامي والعراقي واليمني والمصري , والاوروبي والامريكي والافريقي , تجمع العربي والاعجمي , تجمع الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي , فهلموا الى خلافتكم , فلقد قاتلتم سنين طويله لاعادتها وتحكيم شرع الله , وها هي عادت , فإلتحقوا بركبها , ولا تكونوا كاليهود حين قال الله تعالى عنهم , " فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به "

খেলাফত সকল মুসলিমকে একত্রিত করে। শামী, ইরাকী, ইয়ামেনী, মিসরী, ইউরোপিয়ান, আমরিকান, আফ্রিকান, আরবী, আজমী, হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী, হাম্বালী সকল মুসলিমকে একতাবদ্ধ করে। অতএব, তোমরা তোমাদের খেলাফতের দিকে ছুটে এসো। বহু দিন যাবত তোমরা খেলাফত কায়েম করার জন্য এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছো। এখন তো তা কায়েম হয়েছে অতএব তার পতাকাতলে সমবেত হও। তোমরা ঐ সকল ইয়াহুদীদের মতো হয়ো না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, (প্রথমে তারা শেষ যামানায় একজন রসুল আসবে এটা গর্বভরে বলে বেড়াতো) কিন্তু যখনই রসুল আসলেন তারা তাকে সুস্পষ্টভাবে চিনে নেওয়ার পরও অস্বীকার করলো।

শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানীর ডাকে সাড়া দিয়ে সকল মুসলিমকে খেলাফতের কাফেলাতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

যে সব বক্তব্য ও লেখনীর উপর নির্ভর করে এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে পাঠকের সুবিধার্থে সেগুলোর তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো। সেই সাথে প্রতিটি বিষয় পৃথকভাবে ডাউনলোড করার জন্য লিংক দেওয়া হলো। পাঠক প্রদত্ত লিংক থেকে বক্তব্যগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। কোনো লিংক যদি অকার্যকর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বক্তার নাম, বক্তব্যের শিরোনাম ও তারিখ অনুযায়ী অনুসন্ধান করলে আশা করা যায় খুব সহজে এগুলো সংগ্রহ করা যাবে।

ক্র:	বক্তা বা লেখকেরর নাম	তারিখ	শিরোনাম ও বিষয়বস্তু
১.	আবু বকর আল-বাগদাদী	০৯-০৪-১৩	জাবহাতুন নুসরা আর দাওলাতকে একত্রিত করে ইরাক ও শামে দাওলাত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা
লিংক:- https://archive.org/details/state_islamic_in_iraq_sham			
২.	আবু মুহাম্মাদ আল-জূলানী	১০-০৪-১৩	আবু বকর আল-বাগদাদীর উপরোক্ত ঘোষনাকে অস্বীকার করে আল-কায়েদাকে বায়াত দেওয়া।
লিংক:- https://www.youtube.com/watch?v=QXZ3YpzF4Mw			
৩.	আবু মুহাম্মাদ আল-জূলানী	১৯-১২-১৩	আল-জাজিরাতে লিকাউল ইয়াওম (لقاء اليوم) নামক প্রোগ্রাম
লিংক:- https://archive.org/details/jazeera-jolany			
৪.	আবু মুহাম্মাদ আল-জূলানী	২৭-০৫-১৫	আল-জাজিরাতে বিলা হুদুদ (بلا حدود) নামক প্রোগ্রাম-০১
লিংক:- https://archive.org/details/joulani-liqaa			
৫.	আবু মুহাম্মাদ আল-জূলানী	১৩-০৬-১৫	আল-জাজিরাতে বিলা হুদুদ (بلا حدود) নামক প্রোগ্রাম-০২
লিংক:- https://archive.org/details/joulani-liqaa			
৬.	আয়মান আজ-জাওয়াহেরী	০৯-০৬-১৩	উভয় দলের মাঝে মিমাংসা
লিংক:- https://www.youtube.com/watch?v=Dxinhq3Y2lQ			
৭.	আবু বকর আল-বাগদাদী	১৫-০৬-১৩	ইরাক ও শামে দাওলাতে ইসলাম টিকে থাকবে (باقية في العراق والشام)
লিংক:- https://archive.org/details/seham_201307			
৮.	আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী	২০-০৬-১৩	তাদের ছেড়ে দাও যা খুশি অপবাদ দিক (ذرهم وما يفترون)
লিংক:- https://archive.org/details/Zarhum.Adnani			
৯.	আয়মান আজ-জাওয়াহেরী	০২-০৫-১৪	শামের মুজাহিদদের রক্তের সুরক্ষার জন্য সাক্ষ্য (شهادة لحقن دماء المجاهدين في الشام)
লিংক:- https://archive.org/details/shehadaemam			

১০.	আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী	১১-০৫-১৪	দুঃখিত হে আল-কায়েদার আমীর (عذرا يا أمير القاعدة)
লিংক:- https://archive.org/details/o3thraaa			
১১.	আয়মান আজ-জাওয়াহেরী	এপ্রিল-০৮	খোলা আলোচনা (اللقاء المفتوح) পর্ব-০২
লিংক:- http://www.archive.org/download/ayma...ri/leqa2_2.mp3			
১২.	আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী	৩০-০৯-১৩	ওহে নির্যাতিত দাওলাহ তোমার পক্ষে কেবল আল্লাহই আছেন (لك الله أيتها الدولة المظلومة)
লিংক:- https://archive.org/details/dwlh-mdhlmh-3dnn_201408			
১৩.	আবু মুহাম্মাদ আল-জূলানী	০৭-০৯-১৩	শামের ভূমিতে আল্লাহকে ভয় করো (الله في ساحة الشام)
লিংক:- https://archive.org/details/Allah-sham			
১৪.	আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী	২৩-০১-১৪	শারয়ী বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব
লিংক:- https://www.youtube.com/watch?v=0hEY397JBgs			
১৫.	আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী	০৭-০৩-১৪	এসো আমরা মুবাহালা করি এবং মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিসাপ দিই (ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي الكاذبين)
লিংক:- https://archive.org/details/nabtahil_201408			
১৬.	আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী	২৯-০৬-১৪	এটা আল্লাহর ওয়াদা (খেলাফতের ঘোষণা) (هذا وعد الله)
লিংক:- https://archive.org/details/Waad_201408			
১৭.	আবু বকর আল-বাগদাদী	০৪-০৭-১৪	জুময়ার খুতবা
লিংক:- https://archive.org/details/khutba01			
১৮.	মুহাম্মাদ বিন রিযক তুরহুনী	-	দাওলাতে ইসলামের আলেম কারা?
লিংক:- https://www.youtube.com/watch?v=lA9dB66Pu10			
১৯.	আয়মান আজ-জাওয়াহেরী	১৩-০৮-১৫	তালেবানদের নতুন নেতা মানছুরের হাতে বায়াত
লিংক:- https://www.youtube.com/watch?v=v1FiEZdkJ4w			
২০.	আস-সমুদ সংখ্যা নং- ১০০	জুলাই-১৪	মোল্লাহ ওমদের নামে প্রকাশিত ঈদুল ফিতরের বার্তা যেখানে সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ওয়াদা করা হয়েছে।
লিংক:- https://ia902506.us.archive.org/23/items/alsumood100/alsumood100.pdf			
২১.	আস-সমুদ সংখ্যা নং- ১১১	জুলাই-১৫	দাওলাতের নিকট পাঠানো মানছুরের চিঠি
লিংক:- https://ia801005.us.archive.org/6/items/alsomood111/111.pdf			
২২.	আস-সমুদ সংখ্যা নং- ১১৪	অক্টবর-১৫	তালেবানদের পক্ষ থেকে মোল্লা উমরের মৃত্যুর খবর স্বীকার করা
লিংক:- http://www.mediafire.com/view/z82i25758g7t414/21._Al_Sumood_114.pdf			
২৩.	আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী	-	যারকাবীর জন্য একটি উপদেশ ও সহযোগিতা (الزرقاوي–مناصرة ومناصحة)

লিংক:- https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=20682			
২৪.	আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী	-	যারকাবী সম্পর্কে আল-জাজিরাতে সাক্ষাতকার
লিংক:- https://www.youtube.com/watch?v=8EYVO98K4Vo			
২৫.	আবু বছীর আত-তুরতুশী	১৫-০৪-১৫	জাবহাতুন নুসরার ব্যাপারে ফতোয়া
লিংক:- www.abubaseer.bizland.com/hadath/Read/hadath%20110.pdf			
২৬.	আবু মুনযির আশ-শানক্বীতি	১৫-০৭-১৪	শরীয়তের মানদন্ডে খেলাফতের ঘোষণা (إعلان الخلافة في الميزان الشرعي)
লিংক:- http://justpaste.it/kil-mon			
২৭.	আবু মুনযির আশ-শানক্বীতি	০৯-০১-১২	আবু বছীরের চিন্তাধারার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে (التبصير بحقيقة منهج الشيخ أبي بصير)
লিংক:- http://justpaste.it/g0zi			
২৮.	আবু ক্বাতাদা আল-ফিলিস্তিনী	-- জুলাই-১৪	খলীফার ছদ্মবেশ (ثياب الخليفة)
লিংক:- https://archive.org/details/thyaab_klefha			
২৯.	হানি আস-সুবায়ী	-	যে মুক্তি পেতে চায় সে জেনে বুঝে মুক্তি পাক .. (ليحي من حي عن بينة وليهلك من هلك علي بينة)
	তারিক আব্দুল হালীম	-	যে মুক্তি পেতে চায় সে জেনে বুঝে মুক্তি পাক .. (ليحي من حي عن بينة وليهلك من هلك علي بينة)
লিংক:- http://justpaste.it/mufasala			
৩০.	আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী	২৩-০৬-১৫	হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহর দ্বীনের দা'য়ীর কথায় সাড়া দাও। (يا قومنا أجيبوا داعي الله)
লিংক:- https://archive.org/details/dadaw_20150623_1630			
৩১.	আয়মান আজ-জাওয়াহেরী	-	ইসলামী বসন্ত (الربيع الإسلامي) পর্ব-০১
লিংক:- https://archive.org/details/rbe3_eflame1			
৩২.	আয়মান আজ-জাওয়াহেরী	-	ইসলামী বসন্ত (الربيع الإسلامي) পর্ব-০৩
লিংক:- https://archive.org/details/selsila-3			
৩৩.	আয়মান আজ-জাওয়াহেরী	-	ইসলামী বসন্ত (الربيع الإسلامي) পর্ব-০৫
লিংক:- https://archive.org/details/rabi3-islami5			